সেচপত্র

জানুয়ারি-২০০৭

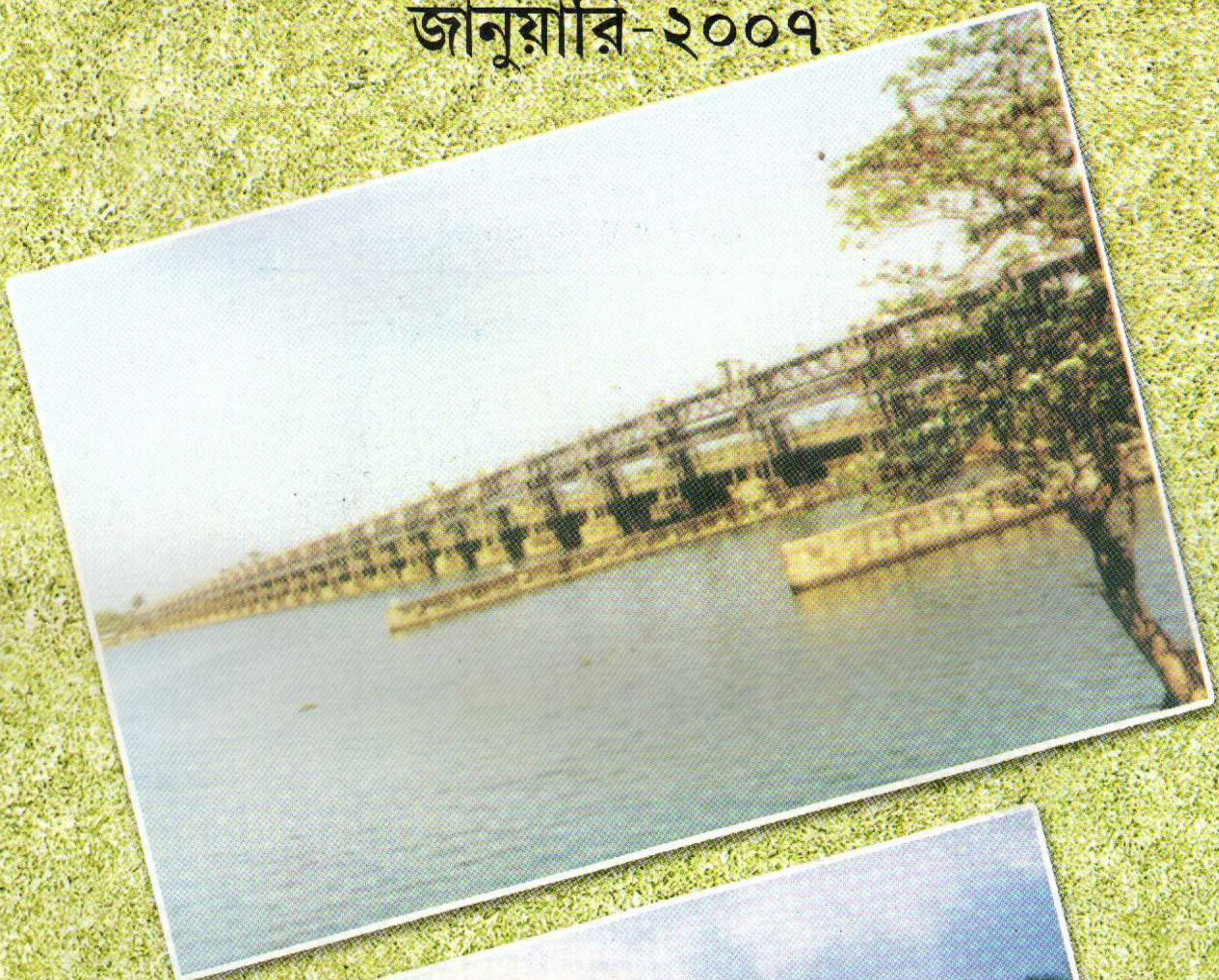

Irrigation & Waterways Dept. Govt.of West Bengal

LOCATION | STATE FEATURES | IRRIGATION SEC. | FLOOD MGMT | P.R & S CELL

towards a better life

Daily river & rain gauge data

Search go!

©,2001 Irrigation & Waterways Dept.
All rights reserved.

The Department

Irrigation Department came into being in the year 1920, separating out from Public Works Department and was named Irrigation & Waterways only in 1946. In the pre-plan period i.e., prior to 1951, irrigation was effected through Diversion Schemes on rivers Kangsabati and Damodar. Irrigation potential created upto 1951 was of the order of 1,39,000 ha. Now the department is entrusted with the task of providing irrigation facilities, offering reasonable protection against flood, alleviating drainage congestion, arresting erosion, maintaining internal navigation channels and up-keeping the natural waterways in the state. Since 1951 till date several Major and Medium Irrigation Projects, number of Embankment Schemes, Town protection Schemes, Drainage Schemes, Anti River Bank Erosion Schemes & Anti Sea - Erosion Schemes have been taken up by the department. With the help of existing Rain Gauge stations and River Gauge stations and collection of data and interaction with some relevant departments like CWC, IMD etc., a Flood Warning System has been developed. The department has a Public Relations & Statistical cell which publishes a news magazine "Sechpatra" both in Bengali & English regularly.

Achievements

সেচপত্র

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সেচ ও জলপথ বিভাগের মুখপত্র

দ্বাদশ বর্ষ □ জানুয়ারি ২০০৭

সম্পাদকীয় বিভাগ

সভাপতি
সুভাষ নস্কর
মন্ত্রী, সেচ ও জলপথ বিভাগ

প্রধান সম্পাদক
দীপক কুমার মাইতি
মুখ্য বাস্তুকার-১

সংযুক্ত সম্পাদক
রাজকাপুর শর্মা
নির্বাহী বাস্তুকার

রঘুনাথ গোস্বামী
সহ-বাস্তুকার

দিলীপ কর্মকার
অবর সহ-বাস্তুকার

জলসম্পদ ভবন □ বিধাননগর, সল্টলেক
দূরভাষ : ২৩৫৮-০৫২৮ □ ফ্যাক্স : ০৩৩-২৩৩৪-৬২৪৫/২৩২১-৪৯২৮
ই-মেল : ce2iwd@cal3vsnl.net.in
ওয়েব সাইট : www.wbiwd.com

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সেচ ও জলপথ বিভাগের পক্ষে সমর কুমার দাস, অধীক্ষক বাস্তুকার, কর্তৃক জলসম্পদ ভবন, বিধাননগর থেকে প্রকাশিত ও বসুমতী কর্পোরেশন লিমিটেড, ১৬৬ বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০১২ হইতে মুদ্রিত / ২০০৭

সেচপত্র

সেচপত্র

সূচিপত্র

সম্পাদকীয়

শুভেচ্ছা ❖ সুভাষ নস্কর, ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী, সেচ ও জলপথ বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

শুভেচ্ছা ❖ শক্তিপ্রসাদ দত্ত, সচিব, সেচ ও জলপথ বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

পাঠকের কলম

দামোদর উপত্যকা বাঁধ ও সেচ প্রকল্প ❖ অঞ্জন দাশগুপ্ত, অবসরপ্রাপ্ত মুখ্য বাস্তুকার, সেচ ও জলপথ দপ্তর ৭

সংক্ষিপ্ত সংবাদ : ১৯

বনসৃজন যখন সমস্যা ❖ গোবিন্দলাল ব্যানার্জি, নির্বাহী বাস্তুকার, সেচ ও জলপথ দপ্তর ২২

সেচ পরিক্রমা জেলা : বাঁকুড়া ❖ দিলীপ কর্মকার, অবর সহ-বাস্তুকার, সেচ ও জলপথ দপ্তর ২৪

ইছামতী ফিরছে আবার ইছামতীতেই—একটি প্রতিবেদন ❖ শচীন দাশ, প্রাক্তন পরিসংখ্যান ও প্রকাশক সহায়ক, সেচ ও জলপথ দপ্তর ৩১

বিশ্ববিচিত্রা ❖ সংকলন : অঞ্জন দাশগুপ্ত, অবসরপ্রাপ্ত মুখ্য বাস্তুকার, সেচ ও জলপথ দপ্তর ৩৫

প্রচ্ছদ পরিচিতি :

প্রথম প্রচ্ছদ : দুর্গাপুর ব্যারেজ (উপরে), সেচসেবিত এলাকার ধানখেতের চিত্র (নীচে)

দ্বিতীয় প্রচ্ছদ : সেচ ও জলপথ বিভাগের ওয়েবসাইট

তৃতীয় প্রচ্ছদ : সেচ ও জলপথ বিভাগের বন্যা বিষয়ের ওয়েবসাইট

চতুর্থ প্রচ্ছদ : কুলটিতে ড্রেনেজ পাম্পিং স্টেশনের উজানের চিত্র (উপরে)
পাম্পিং স্টেশনের যন্ত্রাংশের চিত্র (নীচে)

সম্পাদকীয়

সেচ ও জলপথ বিভাগের মুখপত্র 'সেচপত্র' দ্বাদশ বর্ষে পড়ল। সাময়িক কিছুটা অসুবিধা থাকায় সংখ্যাটি বেরোতে বিলম্ব হল। এই সংখ্যায় আমরা দামোদর উপত্যকা বাঁধ ও সেচ প্রকল্পের বিস্তারিত আলোচনা রেখেছি। দামোদর নদ ও তার শাখানদী ও উপনদীসমূহের জলভাণ্ডারের মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি জেলার সেচব্যবস্থার ধারাবাহিক উন্নয়নের চিত্র ও বন্যা মোকাবিলায় এই প্রকল্পের কার্যকারিতা আলোচিত হয়েছে সুদীর্ঘ এই লেখাতে। জেলাভিত্তিক সেচ পরিক্রমা যা পূর্বে শুরু হয়েছিল, এবারেও তা বহাল থাকছে বাঁকুড়া জেলার সেচ পরিক্রমার মাধ্যমে। বনসৃজনের একটি আলোচনাও রয়েছে এই সংখ্যাতে। এ ছাড়া অন্যান্য নিয়মিত বিভাগ যেমন রয়েছে, তেমনি রয়েছে আরও অন্যান্য নানান তথ্য যেগুলি পাঠকদের আকৃষ্ট করবে।

বিগত সংখ্যাগুলির মতো এ-সংখ্যাটিও সকলের কাছে সমানভাবে আকর্ষণীয় হয়ে উঠবে বলে আশা রাখি।

শুভেচ্ছাপত্র

দ্বাদশ বর্ষে পদার্পণ করল পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সেচ ও জলপথ বিভাগের মুখপত্র 'সেচপত্র'। বিগত ১১ বছর যাবৎ সেচ দপ্তরের বিভিন্ন কাজকর্মের আলোচনা ও প্রযুক্তিবিদদের সুচিন্তিত মতামত প্রকাশিত হয়েছে এই পত্রিকায়। সেচপত্রের মাধ্যমে রাজনীতিবিদ, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও স্কুল-কলেজের শিক্ষকবৃন্দ, ছাত্রছাত্রীসহ বিভিন্ন স্তরের মননশীল সাধারণ পাঠকের কাছে বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও সেচব্যবস্থার চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। দপ্তরের বাস্তুকারসহ অন্যান্য বাস্তুকারদের মতামত ও অনেক বিদগ্ধজনের অভিমত পত্রিকায় প্রকাশের ফলে অনেক সমস্যা ও তার সমাধানে রেখাপাত হয়েছে।

আগামী দিনে সামগ্রিক সেচসুবিধা বৃদ্ধি ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ এবং আনুষঙ্গিক নানান বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের সুচিন্তিত মতামত সেচপত্র প্রকাশ করবে এই আশা করি ও এতদ্দ্বারা সংশ্লিষ্ট সকল স্তরে দপ্তরের কাজকর্ম, সমস্যাবলী সম্ভাবনা ইত্যাদি বিষয়ে সম্যক ধারণার প্রচার ও প্রসার ঘটবে।

দ্বাদর্শ বর্ষে পত্রিকা প্রকাশের প্রাক্কালে এই পত্রিকার সাফল্য কামনা করি ও সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

সুভাষ নস্কর
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী
সেচ ও জলপথ বিভাগ
পশ্চিমবঙ্গ সরকার
২৪/১/২০০৭

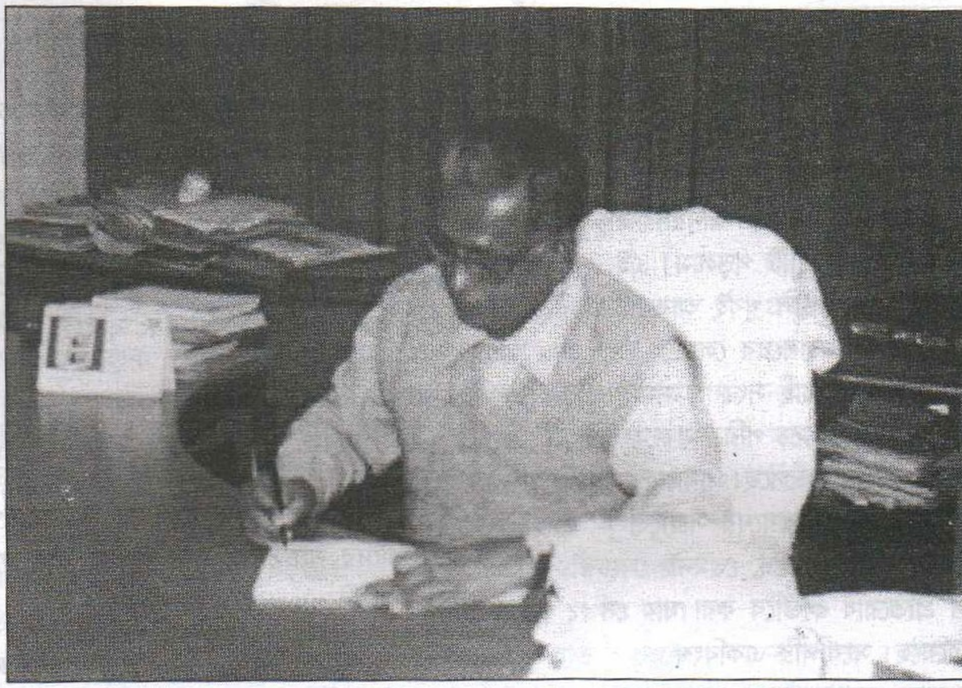

শুভেচ্ছা

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সেচ ও জলপথ বিভাগের মুখপত্র 'সেচপত্র' এগারো বর্ষ অতিক্রম করে দ্বাদশ বর্ষে পদার্পণ করল। ইতিমধ্যে এই পত্রিকার বিগত সংখ্যাগুলিতে সেচ দপ্তরের বিভিন্ন কাজকর্মের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের আলোচনা প্রকাশিত হয়েছে। রাজ্যের সেচব্যবস্থা ও বন্যা নিয়ন্ত্রণে সেচ ও জলপথ বিভাগের কর্মকাণ্ড এই পত্রিকার মাধ্যমে জনপ্রতিনিধি, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও স্কুল-কলেজের শিক্ষকবৃন্দ, ছাত্র-ছাত্রীসহ বিভিন্ন স্তরের মননশীল সাধারণ পাঠকের কাছে পৌঁছে দেওয়া গেছে ও তা গুরুত্ব লাভ করেছে। আশা করি আগামী দিনের পত্রিকার সংখ্যাগুলিতেও সমান ভাবে সেচ দপ্তরের বিভিন্ন কাজকর্মের আলোচনা ও প্রযুক্তিবিদদের সুচিন্তিত মতামত প্রকাশিত হবে।

'সেচপত্র' পত্রিকার দ্বাদশ বর্ষে প্রকাশের প্রাক্কালে সাফল্য কামনা করছি।

শক্তি প্রসাদ দত্ত
সচিব
সেচ ও জলপথ বিভাগ
পশ্চিমবঙ্গ সরকার
৮/২/২০০৭

পাঠকের কলম

মাননীয় সম্পাদক মহাশয়,

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সেচ ও জলপথ বিভাগ থেকে প্রকাশিত 'সেচপত্র' জানুয়ারি-মার্চ ও এপ্রিল-জুন ২০০৫ সংখ্যাটি পড়লাম। এই সংখ্যার তথ্যভিত্তিক লেখাগুলি খুবই আকর্ষণীয়। বিশেষ করে মানিক দে মহাশয়ের লেখা 'অনুকৃতি বা মডেল-জলপ্রবাহ সংক্রান্ত সমস্যা সমাধানের চাবিকাঠি' ও 'সেচ পরিক্রমা : জেলা পুরুলিয়া' আমার ভালো লেগেছে। এখানে যেমন বিভিন্ন মডেল এবং এর বিশ্লেষণের সাহায্যে নদীসমূহের ভাঙন বর্ণিত হয়েছে, তেমনই সেচের মাধ্যমে ভাঙন প্রতিরোধ কীভাবে করা যায় সে কথাও বলা হয়েছে। সর্বোপরি একবিংশ শতাব্দীর সব থেকে বড়ো সমস্যা জলসম্পদের ব্যবহার ও সংরক্ষণ সংক্রান্ত অঞ্জন দাশগুপ্ত মহাশয়ের লেখাটি এই সময়ে খুবই উপযোগী।

পরবর্তী অন্যান্য সংখ্যাগুলিও পড়ার জন্য আকাঙ্ক্ষা রইল।

ধন্যবাদান্তে—

রঘুনাথ দাস

বেলঘরিয়া, শরৎপল্লি, কলকাতা-৫৬

মাননীয় সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু,

সর্বপ্রথমেই আপনাকে জানাই আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা। গত ১৯ থেকে ২৮ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত 'ভারত ক্রান্তি উৎসব'-এ আপনাদের প্রদর্শিত মডেলগুলি আমাদের বেশ আকর্ষিত করেছে। তার সঙ্গে আপনাদের দপ্তরের প্রকাশিত 'সেচপত্রে'র তথ্যভিত্তিক আলোচনা যথেষ্ট প্রশংসার দাবি রাখে। পত্রিকার প্রচ্ছদপট এবং ব্যবহৃত কাগজও উন্নতমানের।

আমি আপনাদের জানাতে চাই, এই তথ্য ভিত্তিক পত্রিকাগুলি এলাকাভিত্তিক ভাবে বিভক্ত করে পঞ্চায়েত ও জেলা পরিষদের মাধ্যমে এলাকার সর্বসাধারণকে অবগত করে তাদের সচেতনতা বৃদ্ধি করলে কৃষিকার্যের মাধ্যমে কৃষককুল বিশেষভাবে উপকৃত হবে।

শুভেচ্ছান্তে—

ভজহরি দাস

বারুইপুর, দক্ষিণ ২৪-পরগনা

মাননীয় প্রধান সম্পাদক,

গত ২০০৬-এর ডিসেম্বরে কুলতলী, সুন্দরবন কৃষি মেলার আমি একজন দর্শক। সরকারি ব্যবস্থাপনায় সেচ ও জলপথ বিভাগীয় যে স্টলটি প্রদর্শিত হয়েছে তা একটি ব্যতিক্রমী। দপ্তরের সেসব প্রদর্শনী (নদী সম্বন্ধীয়) খুবই উপযোগী। আপনাদের যে পত্রিকা প্রদর্শন করা হয়েছে তা খুবই উন্নতমানের। আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি, আমাদের এলাকায় নদী পরিকল্পনার বিশেষ কিছু তথ্য যদি পাওয়া যায় তাহলে ব্যক্তিগত উদ্যোগে সংগ্রহ করে আমাদের এলাকার কৃষকদের উন্নতিকল্পে উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারি।

এই ব্যাপারে নিয়মিত গ্রাহক হবার জন্য নিয়মাবলী জানালে বাধিত হব।

ধন্যবাদান্তে—

অরবিন্দ মণ্ডল

বলবেলিয়া, মথুরাপুর,
দক্ষিণ ২৪-পরগনা

সেচপত্র নিজে পড়ুন অন্যকে পড়ান
আপনার মতামত জানান।

দামোদর উপত্যকা বাঁধ ও সেচপ্রকল্প

অঞ্জন দাশগুপ্ত

১. ভূমিকা

১.১ বিহার ও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে দামোদর নদ এবং তার শাখানদী ও উপনদী-সমূহের জলসম্পদ ব্যবহার করে সেচের জল কৃষিক্ষেত্রে সরবরাহের উদ্দেশ্যে দামোদর উপত্যকা বাঁধ ও সেচপ্রকল্পটি রচিত হয়। নদী উপত্যকাটির অন্তর্ভুক্ত সমগ্র জলসম্পদকে কাজে লাগিয়ে একটি সামগ্রিক উন্নতিকল্পে ডি.ভি.সি. বা দামোদর উপত্যকা নিগম নামে একটি স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। এই প্রকল্পটির অধীন মূল অঙ্গগুলি হল তিলাইয়া, মাইথন, কোনার ও পাঞ্চেতে চারটি বহুমুখী বাঁধ, দামোদর নদের উপর দুর্গাপুরে একটি ব্যারেজ এবং এই ব্যারেজের উভয় পার্শ্বস্থ তীর থেকে মোট ২৪৯৪ কিমি দীর্ঘ খালের মাধ্যমে মোট ৫,৬৮,৭৭৮ হেক্টর পরিমাণ বিস্তীর্ণ অঞ্চলে সেচের জল সরবরাহ। তদানীন্তন ভারত সরকারের আমন্ত্রণে ১৯৪৫ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের টেনেসী নদী উন্নয়ন সংস্থার ভারপ্রাপ্ত নদীবিজ্ঞানী ও বাস্তুকার এম.এল. ভুরডুইন দামোদর নদী উপত্যকার একটি সর্বাঙ্গীণ উন্নতিকল্পে একটি প্রারম্ভিক পরিকল্পনার সূচনা করেন, এর মধ্যে ছিল বিদ্যুৎ উৎপাদন, সেচব্যবস্থা, নৌ-পরিবহন এবং শিল্প ও পৌর প্রয়োজনে জল সরবরাহ।

১.২ স্বাধীন ভারতের বৃহদায়তন সেচ প্রকল্পের অন্যতম পথিকৃৎ দামোদর উপত্যকা বাঁধ ও সেচপ্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হল খরিফ মরশুমে সেচের জল সরবরাহ এবং রবিশস্য উৎপাদনেও প্রয়োজনীয় সেচ সরবরাহ।

১.৩ দুর্গাপুর ব্যারেজের নির্মাণ কাজ শুরু হয় ১৯৫২ সালে এবং শেষ হয় ১৯৫৮ সালে। সেচের জল সরবরাহ আরম্ভ হয় ১৯৫৬ সাল থেকে। সেচবিভবের যথার্থ দ্রুত রূপায়ণ এবং সেচ এলাকার উন্নতিকল্পে দুর্গাপুরে দামোদর নদের উপরে এই ব্যারেজ এবং খালসমূহের দায়িত্ব ১৯৬৪ সাল থেকে ডি.ভি.সি.র হাত থেকে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সেচ ও জলপথ দপ্তরের উপরে ন্যস্ত হয়।

২. দামোদর নদ পরিচিতি

বিহার রাজ্যের পালামৌ জেলায় ছোটনাগপুর মালভূমির কামারপেট পাহাড়চূড়ায় ৬১০ মি (২০০০ ফুট) থেকে নির্গত হয়ে এই রাজ্যের মধ্য দিয়ে ২৯০ কিমি পথ অতিক্রম করে পশ্চিমবাংলার ব-দ্বীপ পাললিক অঞ্চলে দামোদর নদটির প্রবেশ। পাহাড়ি উচ্চতায় নদটির গতিপথ একটু আঁকাবাঁকা এবং স্বভাবতই খেয়ালি ধরনের। বিহারের হাজারিবাগ ও মানভূম জেলা দুটির মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হওয়ার পরে উত্তর-পশ্চিম দিক দিয়ে বয়ে আসা প্রধান উপনদী বরাকর দামোদরের সঙ্গে মিলিত হয়। বরাকরের উৎপত্তিও এই মালভূমির একটি প্রস্রবণ থেকে। বরাকরের দৈর্ঘ্য ২৪০ কিমি। এর পরে এই সম্মিলিত ধারা ৩২০ কিমি পথ ধরে প্রবাহিত হয়ে পশ্চিমবাংলার সমতলবর্তী অঞ্চলে প্রবেশ করে। ১৬০ কিমি পথ পরিক্রমা করে পূর্বমুখীভাবে চলার পরে এটি দক্ষিণ-পূর্বমুখী দিকে ঘুরে যায়। আরও নিম্নমুখী প্রবাহিত হওয়ার পরে এটি দুটি স্রোত ধরে প্রবাহিত হতে থাকে—এর অন্যতমটি হল আমতা ধারা এবং এটি হুগলি নদীতে গিয়ে পড়ছে। তবে এই ধারাটি অনেকটাই মজে যাওয়া ও ক্ষীণকায়া। দ্বিতীয় বা প্রধান ধারাটি হল মুণ্ডেশ্বরী প্রবাহ-বেগুহামাতে বিভক্ত হওয়ার পর বাকসিতে নদীটি রূপনারায়ণে নির্গত হয়। দামোদর-বরাকরের সম্মিলিত অববাহিকা অঞ্চলের পরিমাণ ২২,০০৬ বর্গকিমি এবং মোট দৈর্ঘ্য ৫৪১ কিমি।

২.২ দামোদর এবং বরাকর দুটি নদীরই একই প্রকার বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। নদীপ্রবাহে রয়েছে সবিরামতা এবং এই প্রবাহ সম্পূর্ণভাবে অববাহিকা অঞ্চলে বৃষ্টিপাতের উপর নির্ভরশীল। একদিকে যেমন শুষ্ক মরশুমে নদীপ্রবাহ কমে গিয়ে শীর্ণ আকার ধারণ করে আবার অন্যদিকে বর্ষার সময়ে এই নদীই ফুলে-ফেঁপে স্রোতস্বিনী হয়ে প্রভূত বন্যার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। উচ্চদিকে প্রবাহিত অঞ্চলে খরস্রোতা এই বিপুল জলরাশি তার দুকূল ভেঙে প্রভূত পলিমাটি বহন করে নিয়ে এসে মধ্য ও নিম্ন প্রবাহ অঞ্চলে তার গতিবেগ হারিয়ে ফেলে এবং নদীবক্ষে এই বিপুল পরিমাণ পলির সঞ্চার করে। তাই অক্টোবর থেকে মে মাস এই শুষ্ক মরশুমে নদীস্রোত একেবারে কমে যাওয়ায় সেচ ব্যবস্থা সম্ভব নয়।

২.৩ দামোদর অববাহিকাকে প্রধানত তিনটি প্রধান ভৌগোলিক অঞ্চলে ভাগ করা যায় :

(ক) উৎপত্তিস্থল থেকে দুটি নদীর মিলনস্থল পর্যন্ত বা উচ্চ অববাহিকা অঞ্চল

(খ) মিলনস্থল থেকে নদীর বাঁক পর্যন্ত—মধ্য অববাহিকা অঞ্চল

(গ) বাঁক নেওয়া থেকে নির্গত স্থান অবধি—নিম্ন অববাহিকা অঞ্চল বা নিম্ন দামোদর এলাকা

২.৪ দামোদরের উপনদী, শাখানদী-সমূহ

দামোদরের উপনদী, শাখানদীর সংখ্যা অনেক। এর মধ্যে প্রধান উপনদী এবং সবচেয়ে বড়টি বরাকর। কয়েকটি উপনদী ও শাখানদী ও তাদের দৈর্ঘ্য এইরকম :

নাম	দৈর্ঘ্য (কিমি)
বরাকর	২৪০
কানানদী	১১৩
মুণ্ডেশ্বরী	৬৪
গাঙ্গুর	
বেহুলা	
বাঁকা	

৩. দামোদরের বন্যার ঘটনাপঞ্জি

দামোদর একদিকে যেমন তার অববাহিকায় বসবাসকারীদের তৃষ্ণা, সেচের জল জুগিয়েছে আবার প্রায়শই বন্যার মাধ্যমে তাদের কাছে ত্রাসের সঞ্চার করেছে। বহুকাল ধরেই ইতিহাসের পাতা ওলটালে দেখা যাবে নিম্ন দামোদর অঞ্চলের মানুষ বর্ষার মরশুমে বন্যার শিকড়। পুরাণ প্রাপ্ত বিবরণ থেকে জানা যায় যে অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়ার দিক থেকেই দামোদরে প্রভূত বন্যা দেখা দেয়। এর পরে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মাপের বন্যা দেখা দেয় দামোদর অববাহিকায়। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য বছরগুলি হল ১৮২৩, ১৮৪০, ১৯১৩, ১৯৩৫, ১৯৪১, ১৯৪৩, ১৯৫৬, ১৯৫৮, ১৯৫৯, ১৯৬১,. ১৯৭৮, ১৯৯৫, ১৯১৩ সালে দামোদর নদীতে এক খুব বড়মাপের বন্যা প্রবাহিত হয় এবং এর সর্বোচ্চ পরিমাণ ছিল আনুমানিক ১৮,৪২৪ কিউমেক (৬,৫০,০০০ কিউসেক) মধ্য উপত্যকা অঞ্চলে। তবে ১৯৪৩-এর বন্যা ছিল এত প্রভূত এবং ব্যাপক যে দশদিনের উপর সড়ক ও রেল যোগাযোগ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। ১৯৫৯ সালে দামোদরে সর্বোচ্চ বন্যা প্রবাহের পরিমাণ ছিল ২২,৯৫৯ কিউমেক (৮,১০,০০০ কিউসেক)। ১৯৭৮ সালে সমগ্র দক্ষিণবঙ্গের উপর দিয়ে চলে বন্যার তাণ্ডবলীলা। দামোদর অববাহিকা প্রচণ্ড বন্যার কবলে পড়ে। এর পরে ১৯৯৫ সালেও বড়মাপের বন্যা প্রবাহিত হয়। নিম্নের সারণিতে দামোদরের কয়েকটি প্রভূত পরিমাণ বন্যার চিত্র তুলে ধরা হল :

সন	সময়কাল	সর্বোচ্চ বন্যার পরিমাণ	
		কিউমেক	কিউসেক
১৯১৩	৬-১২ আগস্ট	১৮,৪২৪	৬,৫০,০০০
১৯৩৫	১১-১৫ আগস্ট	১৮,১৪১	৬,৪০,০০০
১৯৪১	৯-১৩ অক্টোবর	১৭,৯৭১	৬,৩৪,০০০
১৯৫৮	১৪-১৯ সেপ্টেম্বর	১৮,৮৪৯	৬,৬৫,০০০
১৯৫৯	৩০ সেপ্টেম্বর-৩ অক্টোবর	২২,৯৫৯	৮,১০,০০০
১৯৭৮	২৬-২৭ সেপ্টেম্বর	২৪,১২১	৮,৫১,০০০
১৯৯৫			

৪. দামোদর উপত্যকা প্রকল্প

৪.১ দামোদর উপত্যকায় বন্যার প্রকোপ লাঘব করার চিন্তা-ভাবনা শুরু হয় বিগত ঊনবিংশ শতাব্দী থেকেই। দামোদর উপত্যকায় বন্যা প্রতিরোধ ব্যবস্থা, সেচ ও নৌ-পরিবহনের সম্ভাবনার সম্বন্ধে প্রথম পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন আর্নল্ট ১৮৬৩ সালে। এই ব্যাপারে তিনিই ছিলেন পথিকৃৎ। এরই ভিত্তিতে ১৮৮৬ সালে জরিপের পর দামোদরের উপরে ১২টি এবং বরাকরের উপরে ৬টি নির্দিষ্ট স্থানে ড্যামের প্রস্তাবনা হয়। কিন্তু এই কাজে বিরাট পরিমাণ অর্থের প্রয়োজনের কারণে এ নিয়ে আর অগ্রসর হওয়া যায়নি।

৪.২ ১৯০০ সালে আবার দামোদরের বন্যার প্রকোপ লাঘব করার কথা ভাবা হয়। কিন্তু এই ব্যাপার নিয়ে আর বেশিদূর এগোনো যায়নি। ১৯১৩ সালের বিধ্বংসী বন্যার পরে জনমানসে বিরাট প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। তদানীন্তন এবং সেচ দপ্তরের প্রথম মুখ্যবাস্তুকার সি অ্যাডামস্ উইলিয়ামস্ এই সমস্যা নিয়ে ব্যাপক গবেষণা করেন এবং বন্যা নিরোধনকারী জলাধার নির্মাণকল্পে একটি নতুন প্রস্তাবনা দেন। তবে এরও পরিণতি হয় আগের মতোই—প্রস্তাবটি চাপা পড়ে যায়।

৪.৩ ১৯৪৩ সালের ভয়াবহ বন্যার পরে সরকার নড়েচড়ে বসে এবং দামোদর ও তার উপনদী ঘিরে সমস্ত উপত্যকার একাত্ম উন্নতিকল্পে গভীর চিন্তা-ভাবনা শুরু হয়। প্রবল বন্যার কবলে সড়ক ও রেল যোগাযোগ দশদিন ধরে ব্যাহত হয়। তখন চলছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। যাতায়াত পরিষেবা ভেঙে পড়ায় সৈন্যবাহিনী, খাদ্যসামগ্রী, যুদ্ধের সরঞ্জামের চলাচলের অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়ে। দশজনকে নিয়ে একটি জরুরি তদন্ত কমিশন বসে যাঁদের অন্যতম ছিলেন স্বনামধন্য বিজ্ঞানী ডা. মেঘনাদ সাহা এবং বর্ধমানের মহারাজা। তাঁদের সুপারিশ অনুযায়ী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের টেনেসী নদী উপত্যকার (T.V.A.) ধাঁচে একটি পরিকল্পনা নেওয়ার প্রস্তাব নেওয়া হয়। T.V.A. টেনেসী নদী উপত্যকায় বহুমুখী বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে

বিদ্যুৎ সেচব্যবস্থা এবং অন্যান্য প্রভৃত উন্নতিসাধন করেছে। পরবর্তী পদক্ষেপে ভারত সরকার টেনেসী উপত্যকা নিগমের বিশেষজ্ঞ ডব্লিউ.এল.ভুরডুইনকে একটি পরিকল্পনা রচনা করার জন্য নিয়োগ করে এটিই ছিল দামোদর উপত্যকা নিগমের সূত্রপাত। তাঁরই দামোদর নদী উপত্যকার সর্বাঙ্গীণ উন্নতিকল্পে প্রারম্ভিক পরিকল্পনার (১৯৪৫) সূচনার ভিত্তিতে ভারত, পশ্চিমবঙ্গ এবং বিহার সরকারের প্রতিনিধি অধিবেশনে ১৯৪৭ সালের এপ্রিল মাসে প্রস্তাবটি গৃহীত হয় এবং টেনেসী উপত্যকা নিগম এর ধাঁচেই একটি স্বশাসিত নিগম-এর প্রস্তাব নেওয়া হয়। এইভাবেই কেন্দ্রীয় আইন পরিষদ (Act XIV of 1948)-এর নির্দেশ অনুযায়ী দামোদর উপত্যকা নিগম বা ডি.ভি.সি গঠিত হয় এবং ১৯৪৮ সালের জুলাইতে এই নিগমের আত্মপ্রকাশ ঘটে।

৪.৪ ডি.ভি.সি-র উদ্দেশ্যাবলী

দামোদর উপত্যকা নিগম বা ডি.ভি.সি-র মূল উদ্দেশ্যগুলো এইরকম :

(ক) যথার্থ বন্যা নিয়ন্ত্রণ,

(খ) সেচব্যবস্থা, পানীয় জল, নৌ-পরিবহন, নিকাশীর ব্যবস্থা, উন্নতিকরণ এবং পরিচালন,

(গ) বিদ্যুৎ উৎপাদন, পরিবহন এবং বণ্টন ব্যবস্থা,

(ঘ) সমগ্র অববাহিকা অঞ্চলে বনসৃজন এবং ভূমিক্ষয় নিবারণ,

(ঙ) সমগ্র পশ্চাদভূমিতে কৃষি, শিল্প, অর্থনৈতিক উন্নতির নিশ্চিতকরণ।

৪.৫ প্রস্তাবিত সমগ্র দামোদর উপত্যকা উন্নয়নের রূপরেখা

ভুরডুইনের সমগ্র দামোদর উপত্যকা উন্নয়নের পরিকল্পনা ছিল এইরকম :

৪.৫.১ দামোদর ও শাখানদীগুলির সাতটি বিভিন্ন স্থানে বাঁধ ও জলাধার নির্মাণ এবং এর সঙ্গে বের্মোতে একটি অপসারিত বাঁধ (diversion dam)। এই সব জলসঞ্চয়কারী বাঁধের স্থান প্রস্তাব করা হয়েছিল আয়ার (তেনুঘাটের নিকটবর্তী), সোনালপুর (পাঞ্চেত) দামোদরের উপর। বরাকর নদীর উপরে বাঁধের স্থান ছিল তিলাইয়া, দেওলবাড়ি (বলপাহাড়ি) এবং মাইথনে। এ ছাড়া ছিল কোনার ও বোকারো নদীর উপরে একটি করে। এই সাতটি জলাধারের সম্মিলিত জলধারণের ক্ষমতা ছিল ৫৭৭২.৭৬ × ১০⁶ ঘনমিটার (৪৬,৭৮,২৪৫ একর ফুট) যার মধ্যে ৩৫৯৫.৬৪ × ১০⁶ ঘনমিটার পরিমাণ নির্দিষ্ট ছিল বন্যা সীমাবদ্ধতার এবং এর সর্বোচ্চ প্রবাহ ছিল ২৮,৩৩০.৬১ কিউমেক (১০ লক্ষ কিউসেক)। বন্যা আটকাবার পরে এই পরিমাণ জলধারা নিম্নমুখী প্রবাহ হয়ে রনডিয়াতে দামোদরের ৭০৮৪.৬৫ কিউমেক (২.৫০,০০০ কিউসেক) খাতে প্রবাহিত হয়ে বর্ধমানের নীচে বামতীর বরাবর স্থানকে বন্যার কবল থেকে রক্ষা করতে সক্ষম হবে।

৪.৫.২ উপরিউক্ত জলাধারগুলির সর্বত্র জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ করে মোট উৎপাদনক্ষমতা ১৫০ মেগাওয়াট।

৪.৫.৩ দামোদর নদীর উপরে একটি ব্যারেজ নির্মাণ, খালসমূহ খননের মাধ্যমে মোট ৩,০৭,৭১৮ হেক্টর (৭,৬০,০০০ একর) পরিমাণ জমিতে সেচের জল সরবরাহ। পুরানো ব্যবস্থার মাধ্যমে যেখানে সেচের জল সরবরাহ করা হত সেই জমিতেও খরিফ মরশুমে প্রয়োজনীয়। সেচ সংস্থানের পরিকল্পনা ছিল।

৪.৫.৬ ২৪০.৪ কিমি বিস্তৃত দৈর্ঘ্য ১৩২ কেভি লাইন বিশিষ্ট পাঁচটি সাবস্টেশনের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সরবরাহ।

৪.৬ প্রস্তাবিত উন্নয়নের রূপায়ণ

এর পরে দামোদর উপত্যকা নিগম, ভারত, পশ্চিমবঙ্গ এবং বিহার সরকারের প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞরা ভুরডুইনের প্রস্তাবিত উন্নয়ন পরিকল্পনাটি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে এবং যোজনা আয়োগের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে এটির কিছুটা পরিবর্তন করে দুটি স্তরে রূপায়িত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

৪.৭ প্রথম স্তরে নির্মাণ কাজের পরিকল্পনা অনুযায়ী দামোদর উপত্যকা নিগম বরাকর নদীর উপরে তিলাইয়া ও মাইথনে দুটি, কোনার নদীর উপরে কোনারে, দামোদরের উপরে মাইথনে এই চারটি স্থানে বহুমুখী বাঁধ এবং দুর্গাপুরে একটি ব্যারেজের কাজ হাতে নেয়, এর সঙ্গে দামোদরের উভয়তীরে ২৪৯৪ কিমি দীর্ঘ খাল খননের কাজও অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই খালের মধ্যে বামতীরে ১৩৭ কিমি পথ ছিল সেচের সঙ্গে নৌ-পরিবহন ব্যবস্থা। তিলাইয়া, কোনার, মাইথন এবং পাঞ্চেত বাঁধের নির্মাণ কাজ শেষ হয় যথাক্রমে ১৯৫৩, ১৯৫৫, ১৯৫৭ এবং ১৯৫৯ সঙ্গে এবং দুর্গাপুর ব্যারেজের কাজ শেষ হয় ১৯৫৮ সালে।

৪.৮ বন্যা নিয়ন্ত্রণ এবং বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষেত্রে উন্নতি

দামোদর উপত্যকা নিগমের অধীন চারটি বাঁধের মোট জলধারণের ক্ষমতা ছিল ৩৫৭৭ × ১০⁶ ঘনমিটার (২৯ লক্ষ একর ফুট)। এর উপরে ছিল বন্যা ধারণের জন্য ১৮৬২ × ১০⁶ ঘনমিটার (১৫ লক্ষ একর ফুট)। কিন্তু মাইথন ও পাঞ্চেত বাঁধে প্রয়োজনীয় সম্পূর্ণ জমি অধিগ্রহণ না করায় বন্যার জন্য অতিরিক্ত জল সঞ্চয়নের পরিমাণ নেমে দাঁড়ায় ১২৯৫×১০⁶ ঘনমিটারে (১০.৫ লক্ষ একর ফুট)। এর পরে আয়ার বাঁধের পরিবর্তে বিহার সরকার তেনুঘাটে বাঁধ নির্মাণ করে, তবে

এখানে কোনো বন্যা জল সঞ্চয় ছিল না। বর্তমান জমি অধিগ্রহণের প্রেক্ষিতে ১৯১৩ সালের সর্বোচ্চ বন্যাপ্রবাহ ১৮,৪২০ কিউমেককে (৬,৫০,০০০ কিউসেক) ১৫,৫৮৬ কিউমেকে (৫,৫০,০০০ কিউসেক) এবং ১৯৫৯ সালের ২২,৯৮৩ কিউমেককে (৮,১০,০০০ কিউসেক) ৮৩৮৮ কিউমেকে (২,৯৬,০০০ কিউসেক) প্রশমিত করা যাবে।

৪.৯ এই চারটি বাঁধের প্রযুক্তিগত বিবরণী পরিশিষ্ট-১এ দেখানো হল :

৫. সেচব্যবস্থা

৫.১ প্রাক্ দামোদর উপত্যকা সেচব্যবস্থা

৫.১.১ দামোদর উপত্যকা সেচ প্রকল্পের অনেক আগে থেকেই এই অঞ্চলে সেচব্যবস্থার প্রচলন ছিল। উপত্যকাটির ভাটির দিকে ইডেন খাল প্রকল্প নামে একটি সেচব্যবস্থা ছিল। স্যার অ্যাসলি ইডেনের নামে এই প্রকল্পের অধীনে ২২ মাইল (৩৫.৪ কিমি) লম্বা সেচ খাল ছিল। কানা নদী এবং কানা দামোদরের মিলনস্থল বর্ধমান শহরের পশ্চিম শহরতলি অঞ্চল কাঞ্চননগর থেকে বেরিয়ে জামালপুর পর্যন্ত এটি বিস্তৃত। প্রাথমিক স্তরে স্বাস্থ্যের কারণে বর্ধমান শহরের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে দামোদরের খাতে একটি বিধৌত জলস্রোত এবং পানীয় জল সরবরাহের জন্য এই প্রকল্পটি রচিত হয়েছিল। ১৮৭১ সালে প্রকল্পটির কাজ শুরু, খাল খননের কাজ শেষ হয় ১৮৮১তে। ১৮৮৮-৮৯তে ৮১০০ হেক্টর (২০,০০০ একর) পরিমাণ জমিতে সেচের জল সরবরাহ আরম্ভ হয়। এর পরে ১৯২৬ সালে শুরু হয়ে ১৯৩৩ সালে দামোদর খাল প্রকল্পের কাজ শেষ হয়। এখানে মূল খালের দৈর্ঘ্য ছিল ২৬ মাইল (৪১ কিমি) এবং শাখা খালের মোট দৈর্ঘ্য ২৩৩ মাইল (৩৭৫ কিমি) এর মাধ্যমে এই প্রকল্পটি বর্ধমান ও হুগলি জেলার ৮০,৯৭২ হেক্টর (২,০০,০০০ একর) বিস্তীর্ণ অঞ্চলকে সেচসেবিত করত। পানাগড়ের কাছে রনডিয়াতে অ্যান্ডারসন উয়্যার থেকে এটি আরম্ভ হয়েছে। তদানীন্তন বাংলার ছোটলাট স্যার জন অ্যান্ডারসনের নামে এটির নামকরণ হয়। ১৯৩৫ সালে এটি চালু হয় এবং তার পরে দামোদর উপত্যকা সেচব্যবস্থার অঙ্গীভূত হয়।

৬. **দামোদর উপত্যকা বাঁধ ও সেচপ্রকল্প**

৬.১ দামোদর উপত্যকা বাঁধ ও সেচ-প্রকল্পের অন্তর্গত প্রধান অঙ্গগুলির মধ্যে রয়েছে ৬৯২.২ মি (২২৭১ ফুট) দীর্ঘ ব্যারেজ যার বাম ও ডান উভয় তীর থেকেই সেচের খাল বেরিয়েছে। এর মোট নির্গমনের সংখ্যা ৩৪ যার মধ্যে উভয়তীরেই রয়েছে ৫টি করে নীচু জলকপাট। ১৫,৫৬৫ কিউমেক অর্থাৎ ৫,৫০,০০০ কিউসেক বন্যা-প্রবাহকে ২০% ঘনীভূত করে দুর্গাপুর ব্যারেজের নকশা প্রস্তুত করা হয়। বামতীরবর্তী প্রধান খালটিতে নৌ-পরিবহনেরও ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এটি ১৩৬.৮ কিমি দীর্ঘ এবং এটিতে ২২টি লক (Lock) রয়েছে। অগ্রভাগে প্রবাহের পরিমাণ ২৬০ কিউমেক (৯১৮৭ কিউসেক)। অন্যদিকে দক্ষিণ তীরবর্তী প্রধান খালটি ৮৮.৫ কিমি লম্বা এবং প্রারম্ভিক প্রবাহ ৬৪.৩ কিউমেক (২২৭১ কিউসেক)। এই খালটি কিন্তু মূলত সেচখাল। বাম-তীরবর্তী খালটি সেচের জল সরবরাহ করে বর্ধমান, হুগলি ও হাওড়া জেলায় এবং ডানদিকের খালটির সেচ এলাকা বাঁকুড়া জেলা। প্রধান খাল, এদের শাখা খাল এবং সরবরাহকারী খাল ইত্যাদির মোট দৈর্ঘ্য ২৪৯৪ কিমি। দুর্গাপুরে দামোদর নদীর উপর এই ব্যারেজ এবং খালসমূহের দায়িত্ব ১৯৬৪ সাল থেকে ডি ভি সি-র হাত থেকে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সেচ ও জলপথ দপ্তরের উপর ন্যস্ত হয়। ব্যারেজ সম্পর্কিত প্রযুক্তিগত তথ্যাবলী পরিশিষ্ট-২-এ দেওয়া হল।

৬.২ এই প্রকল্পের অধীন মোট সেবিত এলাকার পরিমাণ নীচের সারণিতে দেখানো হল :

৬.৩ পশ্চিমবঙ্গ সরকার ভবিষ্যতে আরও সেচখাল খনন করে আরও অধিকতর স্থানে সেচব্যবস্থার উন্নতি-করণে মোট সেচ এলাকার ৭৫% স্থানকে বাস্তব (net) সেচ এলাকা বলে ধরে নেওয়া হয় এবং এর পরিমাণ গিয়ে দাঁড়ায় ০.৭৫ × ৫,৬৮,৭৭৮ = ৪,২৬,৫৮৪ হেক্টর।

৬.৪ ১৯৫৯ সালে সরকার খরিফ শস্যর সেচ এলাকা কিছুটা পরিবর্তন করে নির্ধারণ করেন ৩,৯৩,৯৬১ হেক্টরে। এর পরে খরিফের জন্য অন্তিম সেচবিভবের পরিমাণ সীমিত হয় ৩,৪২,১০৫ হেক্টরে (৮,৪৫,০০০ একর)। সর্বাধিক খরিফ সেচ হয় ১৯৯১-৯২-এ ৩,৩৩,০১৯ হেক্টর জমিতে। প্রাথমিক অবস্থায় শুষ্ক বা রবি মরশুমে সেচ এলাকার পরিমাণ ধরা হয়েছিল ১,২১,৪৫৭ হেক্টর (৩,০০,০০০ একর)। ১৯৫৯ সালে খুনগার কমিটি এর পরিমাণ কমিয়ে করে ৪০,৪৮৯ হেক্টর (১,০০,০০০ একর)। এর পরে দুর্গাপুরের শিল্পের ক্রমাগত জলের চাহিদা বৃদ্ধি এবং শিল্পের প্রসারের নিরিখে ১৯৬২ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবং দামোদর উপত্যকা নিগম (ডি ভি সি) -এর বাস্তুকারগণ ডি ভি সি জলাধারে লব্ধজল নিয়ে পর্যালোচনা করেন এবং রবি মরশুমে সেচ এলাকার পরিমাণ

একক হেক্টর

জেলা	বামতীর খাল ব্যবস্থা	ডানতীর খাল ব্যবস্থা	মোট
বর্ধমান	৩,০৫,৪৮৮	৬০,০৪২	৩,৬৫,৫৩০
হুগলি	১,৩৫,৮১৯	১০,৩৫৬	১,৪৬,১৭৫
হাওড়া	১৪,৬১৫	—	১৪,৬১৫
বাঁকুড়া	—	৪২,৪৫৮	৪২,৪৫৮
মোট	৪,৫৫,৯২২	১,১২,৮৫৬	৫,৬৮,৭৭৮

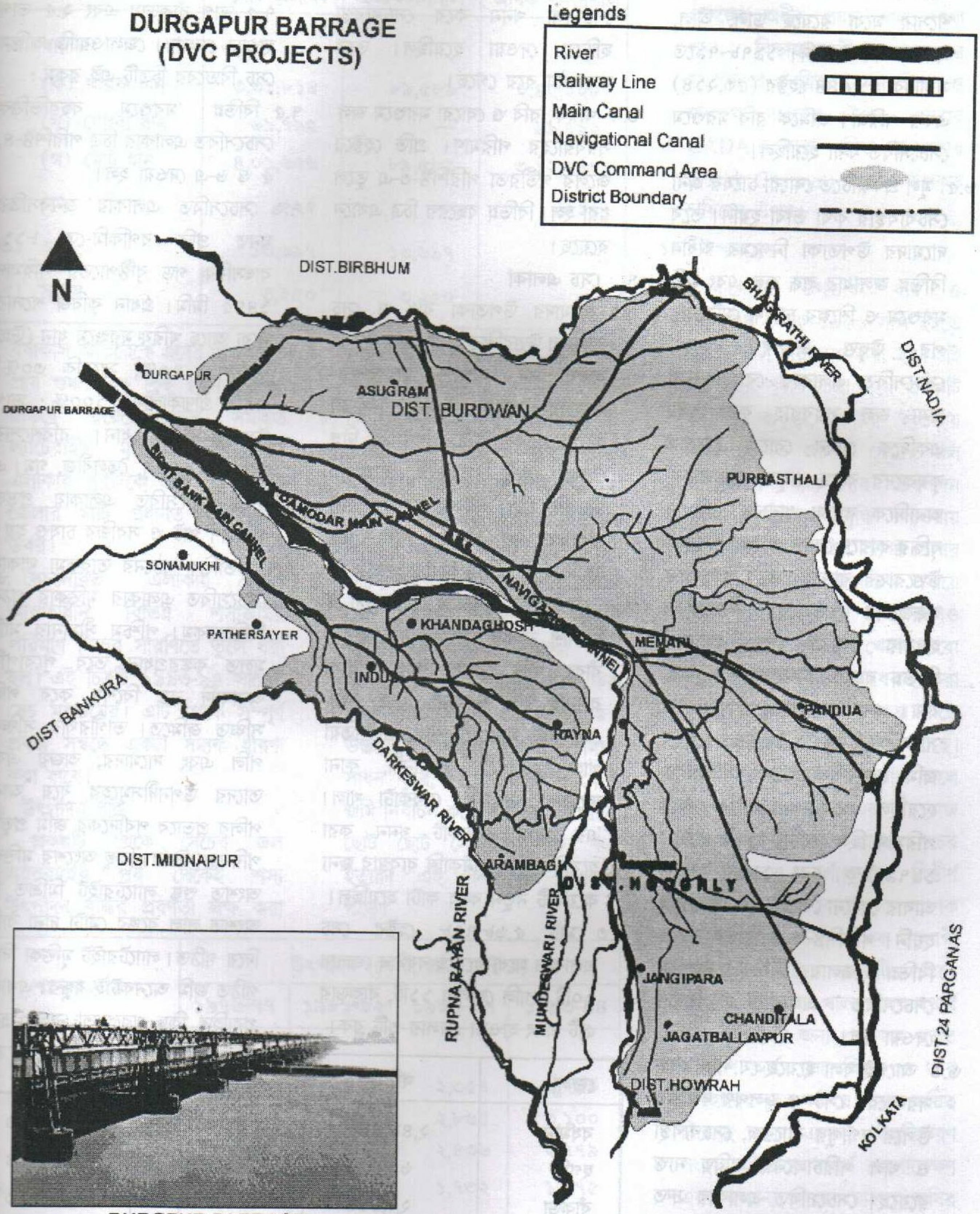

DURGPUR BARRAGE

দপ্তরের
সম্পর্কিত
শিষ্ট-২-এ

সেবিত
সারণিতে

ভবিষ্যতে
আরও
উন্নতি-
৭৫%
এলাকা
বং এর
০.৭৫ ×
হেক্টর।
ফ শস্যর
র্জন করে
হেক্টরে।
অন্তিম
মিত হয়
৪৫,০০০
সেচ হয়
হেক্টর
শুষ্ক বা
পরিমাণ
হেক্টর
৯ সালে
ণ কমিয়ে
০০,০০০
র শিল্পের
দ্ধি এবং
১৯৬২
র এবং
ডি ভি সি)
জলাধারে
রেন এবং
পরিমাণ
কক হেক্টর

ট
২,৫৩০
৬,১৭৫
৩,৬১৫
২,৪৫৮
৮,৭৭৮

কমিয়ে নির্ধারণ করেন ২২,২৬৯ হেক্টর (৫৫,০০০ একর)। এখানে রবি শস্যের মধ্যে রয়েছে ডাল, আলু, সরষে, গম ইত্যাদি। ১৯৭৮-৭৯তে সর্বাধিক ২১,৫৪৪ হেক্টর (৫৩,২১৪) একর পরিমাণ জমিকে রবি মরশুমে সেচসেবিত করা হয়েছিল।

৬.৫ মূল প্রকল্পটিতে বোরো চাষের জন্য সেচব্যবস্থার কথা ভাবা হয়নি। তবে দামোদর উপত্যকা নিগমের অধীন বিভিন্ন জলাধার লব্ধ জল এবং রবি মরশুমে ও শিল্পের চাহিদা মেটানোর পর উদ্বৃত্ত জলের সাহায্যে সেচসেবিত এলাকায় বোরোধানের জন্য জল সরবরাহ করা হয়। একদিকে যেমন বোরো ধানচাষ কৃষকদের কাছে প্রভূত লাভজনক, অন্যদিকে রাজ্যে ধানচাষ পরিমাণ বৃদ্ধির কারণে বোরো চাষের প্রবণতা উত্তরোত্তর বাড়ছে। তবে জলাধারে লব্ধজলের উপরে নির্ভরশীল হওয়ার বোরো সেচ এলাকায় বিভিন্ন বছরে তারতম্য লক্ষ করা যায়। একদিকে যেমন ১৯৭৮-৭৯ সালে সর্বাধিক ১,০৬,৪৭৪ হেক্টর জমি বোরো মরশুমে সেচসেবিত হয়েছিল আবার ১৯৮২-৮৩-এর পরিমাণ ছিল সর্বনিম্ন ১৪৩ হেক্টর। ১৯৭৯-'৮০ এবং ১৯৯২-'৯৩-এ আবার কোনো বোরোসেচ সম্ভবপরই হয়নি। পরিশিষ্ট-৩-এ বিভিন্ন বছরে বিভিন্ন জেলায় বিভিন্ন মরশুমে সেচসেবিত এলাকার পরিমাণ দেওয়া হল।

৬.৬ আগেই বলা হয়েছে যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সেচ ও জলপথ দপ্তরের উপরে দুর্গাপুর ব্যারেজ, সেচব্যবস্থা ও খাল পরিচালনের দায়িত্ব ন্যস্ত রয়েছে। সেচসেবিত এলাকার দ্রুত উন্নতিকরণ এবং সেচবিভবের যথার্থ ব্যবহারের কথা ভেবেই এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল। সেচবিভব ও ব্যবহারের তফাৎটা কমিয়ে আনার জন্য সেচসেবিত এলাকায় ছোট ছোট সেচনালা খনন করে সেচব্যবস্থা ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। তবে তফাতটা রয়ে গেছে।

৬.৭ খরিফ, রবি ও বোরো মরশুমে জল সরবরাহের পরিমাণ। প্রতি হেক্টরে জলের গভীরতা পরিশিষ্ট-৩-এ তুলে ধরা হল। বিভিন্ন বছরের চিত্র এখানে রয়েছে।

৭. সেচ এলাকা

৭.১ দামোদর উপত্যকা বাঁধ ও সেচ প্রকল্পের উত্তরদিকের সীমানায় রয়েছে অজয় নদ, দক্ষিণে দ্বারকেশ্বর। অন্যদিকগুলোতে সীমানা নির্ধারণ করেছে ব্রাহ্মণী, খড়ি, ফরিণগাছি, নিম্ন বেহুলা, কুন্তী, সরস্বতী, রাজাপুর নিকাশি খাল। এইসব নিকাশি খাল প্রকল্পের মূল নিকাশি এবং এরা হুগলি/ভাগীরথীতে নির্গত হচ্ছে।

৭.২ সেচসেবিত এলাকার প্রধান নদী ও নিকাশি নালার মধ্যে রয়েছে কুনুর, বাঁকা, খড়ি, বেহুলা, গাঙ্গুর, ধুসি, রসনাই খাল, ইলসুরা, ঘিয়া, কুন্তী, মেটেখাল, মরামেটে খাল, ডাকাতিয়া খাল, কৌশিকী, কানানদী, কানা দামোদর, সরস্বতী, দেবকাঁটা খাল। এর মধ্যে কয়েকটি খনন করা হয়েছিল এবং সুনিকাশি ব্যবস্থার জন্য কয়েকটি নতুন করে কাটা হয়েছিল।

৭.৩ মোট ৫,৬৮,৭৭৮ হেক্টর সেচ এলাকার মধ্যে রয়েছে বর্ধমান জেলার ২০টি, হুগলি জেলার ১১টি, বাঁকুড়ার ৫টি এবং হাওড়া জেলার ৩টি ব্লক।

৭.৪ এই মোট সেচ এলাকার শতকরা ৬৪ ভাগ বর্ধমানে, ২৬ ভাগ হুগলিতে, ৭.৫ ভাগ বাঁকুড়ায় এবং ২.৫ ভাগ হাওড়া জেলায়। জেলাওয়াড়ি অন্তিম সেচ বিভবের চিত্রটি এই রকম :

৭.৫ বিভিন্ন মরশুমে বছরভিত্তিক সেচসেবিত এলাকার চিত্র পরিশিষ্ট-৪, ৫ ও ৬-এ দেওয়া হল।

৭.৬ সেচসেবিত এলাকায় জনবসতির ঘনত্ব প্রতি বর্গকিমি-তে ৮১১, বাৎসরিক গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ১৪৭৫ মিমি। প্রধান কৃষিজ শস্যের মধ্যে আছে খরিফ মরশুমে ধান (উচ্চ ফলনশীল ৭০%, সাবেকি ৩০%) এবং গ্রীষ্মকালীন ১০০% ভাগ উচ্চফলনশীলন ধান। রবিশস্যের মধ্যে আছে আলু, তৈলবীজ, গম। এ ছাড়া সেচসেবিত এলাকায় প্রভূত পরিমাণ পাট ও সবজির চাষও হয়।

৭.৭ ভূতাত্ত্বিক গঠনের তারতম্য থাকায় সেচসেবিত এলাকার মৃত্তিকার গঠন বিভিন্নরকম। পশ্চিম সীমানার মাটি মূলত কঙ্করপ্রধান তবে পুরোপুরি অনাবাদি নয় বিশেষ করে পলি সঞ্চিত জমিতে। ভাগীরথীর সঞ্চিত পলি এবং দামোদর, অজয় এবং তাদের উপনদীসমূহের বয়ে আনা পলির প্রভাবে পূর্বদিকের জমি প্রভূত পরিমাণে উর্বর। কিছু অংশের মৃত্তিকা অংশত শুষ্ক ল্যাটেরাইট মিশ্রিত বা অংশত লাল রঙের মোটা দানা বালি দিয়ে গঠিত। ল্যাটেরাইট মৃত্তিকা দিয়ে গঠিত জমি অনেকটাই বন্ধুর। এখানে প্রবাহিত কিছু খরস্রোতা নালা, তবে

জেলা	খরিফ	রবি	মোট
বর্ধমান	২,৪৮,৪৯৫	১২,৬৪৮	২,৬১,১৪৩
হুগলি	৬০,৪১৬	৮,৩১৮	৬৮,৭৩৪
বাঁকুড়া	২৭,৪৪৪	৮৭৯	২৮,৩২৩
হাওড়া	৫,৭৫০	৪২২	৬,১৭২
মোট	৩,৪২,১০৫	২২,২৬৭	৩,৬৪,৩৭২

শস্যের নাম	সেচসেবিত এলাকা (হেক্টর)		
	মোট এলাকা	উচ্চফলনশীল	অধিক ফলনশীল
১। ধান :			
(ক) খরিফ ধান	৩,৩১,৮১৪	৮৯,৫৮৯	২,৪২,২২৫
(খ) বোরো ধান	৬৯,৭৯২	—	৬৯,৭৯২
(গ) মোট ধান	৪,০১,৬০৬	৮৯,৫৮৯	৩,১২,০১৭
২। গম	৫২৫	—	৫২৫
৩। আলু	১৩,৬৯৭	১৩,৬৯৭	—
৪। সরষে	৩,২৫০	৩,২৫০	—

বর্ষাকাল ব্যতিরেকে এদের খাত থাকে প্রায় শুষ্ক। কিছু কিছু স্থানে ইতস্তত ছড়িয়ে রয়েছে ছিদ্র সমন্বিত ল্যাটেরাইট মৃত্তিকা। সেচসেবিত এলাকার পূর্বদিকে হুগলি ও হাওড়া জেলার মাটি প্রধানত পলি এবং উর্বর।

৭.৮ সেচসেবিত এলাকায় সেচ আওতাধীন বিভিন্ন শস্যজমির পরিমাণ নিচের সারণিতে তুলে ধরা হল। এই চিত্রটি ১৯৯৩-৯৪ সালের সেচ মরশুমের। এটি থেকে সম্পূর্ণ প্রকল্প সম্বন্ধে একটা সম্যক ধারণা করা যাবে।

৭.৯ উৎপাদন বৃদ্ধি

প্রকল্পটি থেকে সেচের জল সরবরাহের পর থেকেই শস্য উৎপাদন বৃদ্ধির প্রবণতা লক্ষ করা যায়। নিচের সারণি থেকে এর একটা ধারণা করা যাবে :

৮. সেচসেবিত এলাকার উন্নতিকরণ

৮.১ লব্ধ কৃষিজমি, জলসম্পদের সদ্ব্যবহার করে কৃষি সম্পদ বৃদ্ধি তথা সেচবিভব ও ব্যবহারের তারতম্য কমিয়ে আনার স্বার্থে ১৯৭৬-'৭৭ সালে কেন্দ্রীয় সরকারের সহায়তায় সেচ এলাকা উন্নতিকরণ সংস্থার অধীনে দামোদর উপত্যকা সেচ এলাকা উন্নতির কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। ভূগর্ভস্থ জল এবং ভূপৃষ্ঠ জল উভয়কেই ব্যবহার করে এবং সমন্বয় সাধন করে, বিভিন্ন ফসলের যোগ্য জমি নির্বাচন করে সর্বাধিক উৎপাদন, ছোট ছোট সেচনালা খনন করা ইত্যাদি এই কর্মসূচির আওতায় পড়ে।

শস্যের নাম	উৎপাদন (কেজি প্রতি হেক্টরে)			
	১৯৭৬-৭৭	১৯৮১-৮২	১৯৮৬-৮৭	১৯৯৩-৯৪
১। ধান :				
(ক) খরিফ ধান	১,৫৬৩	১,৪৭৮	২,৩৫৭	২,৭৯০
(খ) বোরো ধান	৩,০৬৫	২,৩৭১	২,৮৬৫	৩,১০০
(গ) মোট ধান	১,৬৪৫	১,৪৮২	২,৪৩৬	২,৭৭৯
২। গম	২,১৭২	২,১২৩	১,৭৩২	১,৮৭৫
৩। আলু	১৯,২৭৪	১৮,৯৬১	২১,৭৩৮	২৬,৫০০
৪। সরষে	৮৭৫	১,০০০	৭৩৭	৯৮০

৯. খালব্যবস্থা সংরক্ষণ

৯.১ দামোদর উপত্যকা বাঁধ ও সেচ-প্রকল্পের অধীন প্রধান খাল, শাখা খাল, বিভাজনকারী, জলনালার সংরক্ষণের দায়িত্ব যেমন সেচ ও জলপথ দপ্তরের উপর, আবার CADA'র দ্বারা খনিত মাঠনালার (Field Channel) দায়িত্ব উপকৃত চাষিদের উপর।

১০. উপসংহার

১০.১ দামোদর উপত্যকা বাঁধ ও সেচপ্রকল্প থেকে ১৯৫৬ সাল হইতে সেচের জল সরবরাহ করা হয়। এই ৪৪ বছর সুদীর্ঘ যাত্রা পথে প্রকল্পটি বর্ধমান, বাঁকুড়া, হুগলি, হাওড়ায় বিস্তীর্ণ তৃষিত জমিতে সেচের জল জুগিয়েছে। খাদ্যশস্যের উৎপাদন প্রভূত পরিমাণে বৃদ্ধি পাওয়ায় আর্থসামাজিক উন্নতির যথেষ্ট প্রসার ঘটেছে। প্রকল্পটির প্রারম্ভিক পর্যায়ে বোরো চাষের প্রচলন না থাকলেও ষাটের দশকের শেষভাগ থেকে বোরো মরশুমে সেচের জল সরবরাহ করা হচ্ছে। বোরো চাষের প্রবণতা বেড়ে যাওয়ায় অর্থনৈতিক উন্নতি ঘটছে। নবম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কালে (২০০১-২০০২) এর কাজ সম্পূর্ণভাবে শেষ হয়ে যাচ্ছে। সেচের জল ছাড়াও দুর্গাপুরের বিস্তীর্ণ শিল্পাঞ্চলে জল সরবরাহ করে ব্যাপক শিল্পের প্রসার ঘটানোর এক উদ্যোগী ভূমিকা নিয়েছে প্রকল্পটি। তবে ব্যারেজ এবং তার খালসমূহের যথার্থ রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রয়োজন প্রভূত পরিমাণ অর্থ। সেচ বিভব ও তার ব্যবহারের দূরত্ব কমিয়ে আনার দায়িত্ব নিয়েছে সেচ এলাকা উন্নতিকরণ সংস্থা। এইভাবে যথার্থ রক্ষণাবেক্ষণ এবং অন্যান্য কাজের মাধ্যমে কৃষির উন্নতি, শিল্পের প্রসারের অগ্রগণ্য ভূমিকায় অক্ষুণ্ণ রাখবে এই প্রকল্পটি।

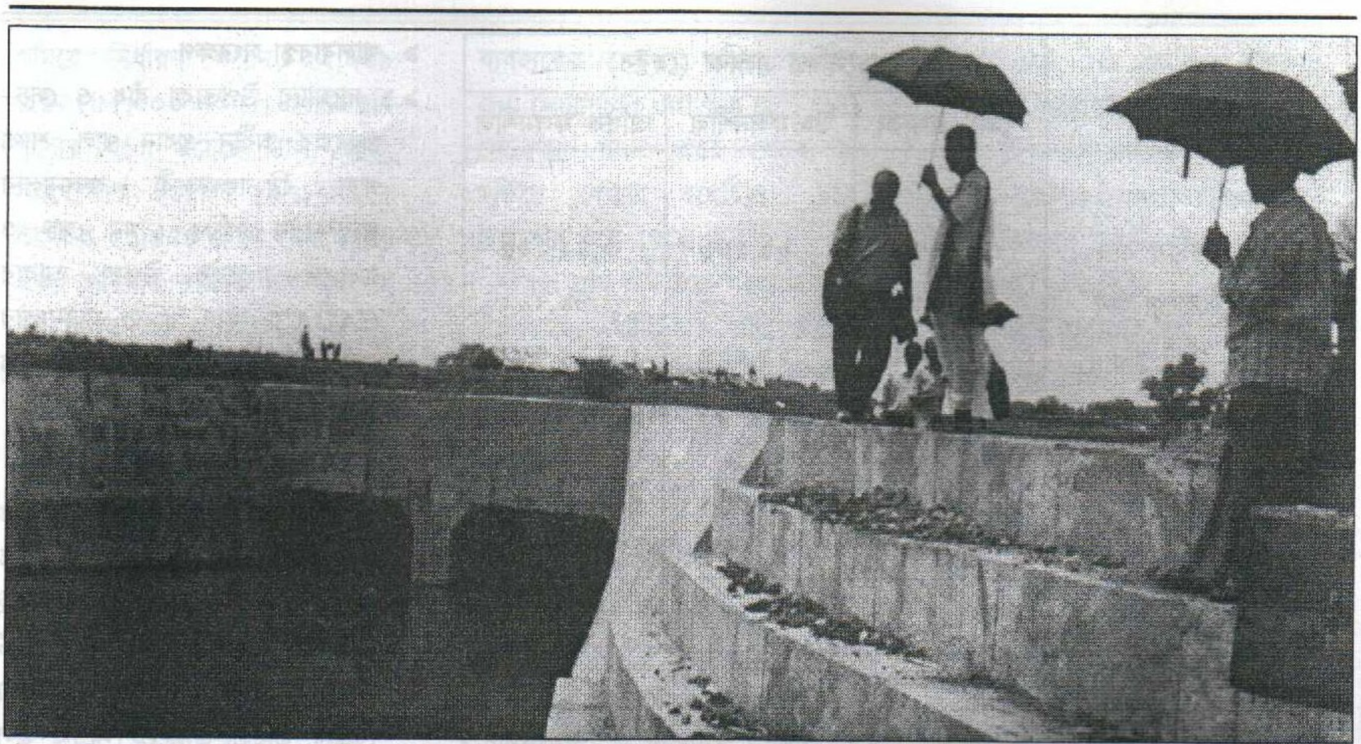

নিম্ন-দামোদরের থালিয়া-বাকসি শর্টকার্ট খালের উপর সাইফোন

পরিশিষ্ট-১

দামোদর উপত্যকা নিগমের অন্তর্গত চারটি বাঁধের প্রযুক্তিগত তথ্যাবলী

		তিলাইয়া	কোনার	মাইথন	পাঞ্চেত
১.	বাঁধের ধরন	কংক্রিট	মিশ্র (মাটি ও কংক্রিট)	মিশ্র (মাটি ও কংক্রিট)	মিশ্র (মাটি ও কংক্রিট)
২.	নদীতল থেকে উচ্চতা (মি)	৩০.১৮	৪৮.৭৭	৫০.০০ (মাটি অংশ) ৪৪.০০ (কংক্রিট অংশ)	৪০.৮৪ (মাটি অংশ) ৪৫.০০ (কংক্রিট অংশ)
৩.	দৈর্ঘ্য (মি)	৩৬৬	২৭৭ (মাটি) ৩৭০৫ (কংক্রিট)	৩৬৩ (মাটি) ৪৪২৭ (কংক্রিট)	৩৭০ (মাটি) ৬৪০৯ (কংক্রিট)
৪.	সড়ক পথের বিস্তার	৩.৬১	৫.৭৯	৬.৭০	১০.৬৭
৫.	জলাধারের ব্যাপ্তি (বর্গকিমি)	৫৯.৫৭	২৫.৯০	১০৬.১৯	১৫২.৮১
৬.	বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা	২×২ মেগাওয়াট	—	৩×২০ মেগাওয়াট	১×৪০ মেগাওয়াট
৭.	জলধারণের ক্ষমতা ($১০^৬$ ঘনমি.)				
	(ক) অক্রিয় জলভাণ্ডার	৭৫.২৫	৬০.৪৪	২০২.২৪	১৬২.৫৭
	(ঘ) কপাট শীর্ষ অবধি	৩৯৪.৭৪	৩৩৬.৭৬	১৩৬১.৬৪	১৪৯৭.৫৪
৮.	বিভিন্ন খাতে নির্দিষ্ট জলভাণ্ডার				
	(ক) সেচ ও বিদ্যুৎ	১৪১.৮৬	২২০.৮১	৬১১.৮৪	২২৮.২১
	(খ) বন্যানিয়ন্ত্রণ	১৭৭.৬৩	৫৫.৫১	৫৪২.৭৬	১০৮৬.৭৬
৯.	জলগ্রহ ক্ষেত্র (বর্গকিমি)	৯৬৪.২	৯৯৭.১	৬২৯৩.১৭	১০৯৬৬.১৩
১০.	প্রবহ অংশের বন্যা পরিবহ ক্ষমতা (কিউমেক)	৩৮২০	৬৭৯৫	১৪৭২৫	১৭৮৪০
১১.	কাজের শুরু	জানুয়ারি, ১৯৫০	জানুয়ারি, ১৯৫০	ডিসেম্বর, ১৯৫১	নভেম্বর, ১৯৫২
১২.	কাজের সমাপ্তি	ফেব্রুয়ারি, ১৯৫৩	অক্টোবর, ১৯৫৫	সেপ্টেম্বর, ১৯৫৭	ডিসেম্বর, ১৯৫৯

পরিশিষ্ট-২
দুর্গাপুর ব্যারেজ সংক্রান্ত প্রযুক্তিগত তথ্যাবলী

১. অবস্থান — বর্ধমান জেলার দুর্গাপুরে দামোদর নদের উপর।
২. জলগ্রহ ক্ষেত্র — ১৯৫৫৫ বর্গকিমি (৭৫৫০ বর্গমাইল)
৩. দৈর্ঘ্য — ৬৯২.২ মি (২২৭১ ফুট)
৪. নিচু জলকপাটের সংখ্যা — ১০ (ডান ও বাম উভয়তীরে পাঁচটি করে)
৫. নির্গমন পথের সংখ্যা — ২৪
৬. সর্বাধিক জল নির্গমনের ক্ষমতা — ১৫,৫৬৫ কিউমেক (৫,৫০,০০০ কিউসেক)
৭. মূল খালের পরিবহন ক্ষমতা :
(ক) বামতীর খাল — ২৬০ কিউমেক (৯১৮৭ কিউসেক)
(খ) ডানতীর খাল — ৬৪.৩০ কিউমেক (২২৭১ কিউসেক)
৮. সর্বাধিক জলসমতল — ৬৪.৪৭ মি (২১১.৫১ ফুট)
৯. সেচ বিভব — ৩,৪২,১৮৫ হেক্টর (৮,৪৫,০০০ একর) খরিফ মরশুম
— ২২,২৬৭ হেক্টর (৫৫,০০০ একর) রবি মরশুম
১০. উপকৃত জেলাসমূহ — বর্ধমান, বাঁকুড়া, হুগলি ও হাওড়া
১১. বন্যাসীমিতকরণ — প্রারম্ভিক পরিকল্পনা অনুযায়ী ২৮,৩২১ কিউমেক (১০ লক্ষ কিউসেক) প্রবাহকে ৭,০৮০ কিউমেক (২,৫০,০০০ কিউসেক) এ দুর্গাপুরে সীমিতকরণের প্রস্তাব ছিল। তবে উজানে তিনটি বাঁধ তৈরি না হওয়ায় লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছান সম্ভব হয়নি।

পরিশিষ্ট-৩
বিভিন্ন সেচ মরশুমে জল ছাড়ার পরিমাণ

বছর	খরিফ মরশুম		রবি / বোরো	
	জল ছাড়ার পরিমাণ ($১০^৬$ ঘনমিটার)	জলের গভীরতা প্রতি হেক্টরে (সেমি)	জল ছাড়ার পরিমাণ ($১০^৬$ ঘনমিটার)	জলের গভীরতা প্রতি হেক্টরে (সেমি)
১৯৭৯-৮০	১৯৩০.০২	৫৯.৪৮	—	—
১৯৮০-৮১	১৯৮৩.৪০	৬১.১২	৯০০.১৮	৯২.৯২
১৯৮১-৮২	১৮৯৭.০৭	৫৮.৫৮	১০১.৪৬	৬৪.৪৩
১৯৮২-৮৩	২২৪৩.৪০	৭৩.৪৫	৭৫.৪৯	৫৬.২৯
১৯৮৩-৮৪	২০৩৩.৩০	৬১.৯৭	৭৩৭.৭৮	১১৯.৩৭
১৯৮৪-৮৫	৮০৫.৪২	২৪.৫৫	৫৫০.১৫	৯৫.১২
১৯৮৫-৮৬	১৯৬০.৭৮	৫৯.৬৩	৯৩৪.৯০	১১৩.২৮
১৯৮৬-৮৭	১৮৩৮.৪৮	৫৬.২০	৬১০.৪৪	৮০.৫৯
১৯৮৭-৮৮	১৬৯৫.৩৭	৫১.৯৩	৬৭৪.৯৬	৮৩.২০
১৯৮৮-৮৯	১৬৩৫.২৩	৪৯.৪১	৪০০.৪১	৮১.২৫
১৯৮৯-৯০	১৬৬৩.২০	৫০.১৮	৫৯৮.১০	৯২.৮৬
১৯৯০-৯১	১৬১৫.৭৫	৪৮.৮০	৭৫৯.০৫	৯১.৫৪
১৯৯১-৯২	১৬০৬.৯৩	৪৮.৩৬	৬৭১.৮৪	৮৮.২১
১৯৯২-৯৩	১৫২২.২৭	৪৬.০১	২৪৭.৪৯	৫০.০০
১৯৯৩-৯৪	১৭৪৮.৮০	৫২.৭০	৬৬৫.৮৬	৭৬.০০

পরিশিষ্ট-৪

সেচব্যবস্থার অগ্রগতি

খরিফ শস্য (সেচক্ষেত্র-হেক্টর)

সাল	বর্ধমান	বাঁকুড়া	হুগলি	হাওড়া	মোট
১৯৬৪-৬৫	১,৯৪,৭৭৬	২০,৪৭৮	৪৬,১৭০	২২৭৯	২,৬৪,৭০৩
১৯৬৫-৬৬	২,০৬,০৯০	২১,৫৫৭	৪৮,৬০২	২৩৯৯	২,৭৮,৬৪৮
১৯৬৬-৬৭	২,০৪,৯৪৮	২১,৪৯০	৪৮,৪৫৩	২৯০২	২,৭৭,৭৯৩
১৯৬৭-৬৮	২,৩৩,৩২৮	২২,২৫৩	৫০,২২৮	৩১২০	২,৭৮,৯২৯
১৯৬৮-৬৯	২,১০,৩০৫	২২,৬৪১	৫২,৭১০	৩২৮৬	২,৮৮,৯৪২
১৯৬৯-৭০	২,১৬,৪৭৯	২৩,১৮৯	৫৪,২৫৭	৩২১৬	২,৯৭,১৪১
১৯৭০-৭১	২,১৯,১৪৯	২৪,২৭৩	৫৬,৪২৭	৩২৬৪	৩,০৩,১১৩
১৯৭১-৭২	২,২০,২৫২	২৪,৬৪৮	৫৬,৬৩১	৩২৫৬	৩,০৪,৭৮৮
১৯৭২-৭৩	২,২১,৪৪০	২৫,১৩৭	৫৭,৯৬২	৩২৭২	৩,০৭,৮১১
১৯৭৩-৭৪	২,২২,৮৩০	২৫,৬৬১	৫৭,৮৫৬	৩২৭২	৩,০৯,৩৪৯
১৯৭৪-৭৫	২,২৩,৪২৭	২৫,৯১৩	৫৭,৩৬১	৩২২৩	৩,০৯,৯২৪
১৯৭৫-৭৬	২,২৫,২৭৬	২৬,৯২৩	৫৭,৭৬২	৩৩২৪	৩,১২,৩৯০
১৯৭৬-৭৭	২,৩১,৪৭৮	২৬,৩৩০	৫৯,৮০৬	৩২৫৫	৩,২০,৮৬৯
১৯৭৭-৭৮	২,৩৬,৫৯৩	২৬,৪৯২	৫৯,৯৮৬	৩২৭৫	৩,২৬,৩৪৬
১৯৭৮-৭৯	২,৩৬,৮৫৮	২৬,১৫৮	৫৯,৮৯১	৩২৭৬	৩,২৬,১৮৩
১৯৭৯-৮০	২,৩৫,৬৫৫	২৬,৪৫২	৫৯,৯১২	৩৬২৫	৩,২৫,৬৪৪
১৯৮০-৮১	২,৩৬,৬৯০	২৬,৫৫৪	৫৮,৮৯৫	৩৬৬০	৩,২৫,৭১৯
১৯৮১-৮২	২,৩৫,৫৯৯	২৬,৫৮০	৫৮,৭৪৯	৩৯০০	৩,২৪,৮২৮
১৯৮২-৮৩	২,১৮,৪৮২	২৬,৫৯৭	৫৫,৫১৮	৪৭২২	৩,০৫,৩১৯
১৯৮৩-৮৪	২,৩৭,৮৩৮	২৬,৬৩০	৫৮,৮৩০	৪৭২৪	৩,২৮,০২২
১৯৮৪-৮৫	২,৩৭,৬৭৭	২৬,৭১৯	৫৮,৮৯৫	৪৭২৪	৩,২৮,০১৫
১৯৮৫-৮৬	২,৩৬,৯১৪	২৭,১২০	৫৯,২৯৫	৫২২৪	৩,২৮,৫৫৩
১৯৮৬-৮৭	২,৩৭,৯৩২	২৬,৭৪৯	৫৭,৭৫৩	৪৭২৪	৩,২৭,১৫৮
১৯৮৭-৮৮	২,৩৭,৬৫৪	২৬,৭৬৪	৫৭,৩০৬	৪৭২৪	৩,২৬,৪৪৮
১৯৮৮-৮৯	২,৪০,১৫১	২৬,৭৬৪	৫৮,৯৩০	৪৭২৪	৩,৩০,৫৬৯
১৯৮৯-৯০	২,৪২,৯৬২	২৪,৮১০	৫৮,৯৪০	৪৭২৪	৩,৩১,৪৩৬
১৯৯০-৯১	২,৩৯,৫৭৭	২৭,৫৮৯	৫৯,১৭৮	৪৭৩৭	৩,৩১,০৮১
১৯৯১-৯২	২,৪১,৫১৪	২৭,৫৯০	৫৯,১৭৮	৪৭৩৭	৩,৩০,০১৯
১৯৯২-৯৩	২,৪০,১৬৩	২৭,৭৫৬	৫৭,৮৩৮	৪৭২৪	৩,৩০,৪৮১
১৯৯৩-৯৪	২,৪১,৫৫৫	২৬,৭১৭	৫৮,৯৭৭	৪৫৬৪	৩,৩১,৮১৩
১৯৯৪-৯৫	২,৩৭,৭১২				
১৯৯৫-৯৬	২,৪১,২৮৫	২৬,৮৭৮	৫৮,৯৪৫	৪৬৩০	৩,৩১,৭৩৮
১৯৯৬-৯৭	৩,৩৭,৯২০				
১৯৯৭-৯৮	২,৪১,৫৫৪	২৭,০৬২	৫৯,০০০	৫০৭৫	৩,৩২,৬৯১
১৯৯৮-৯৯	২,৪৫,৫৫০	২৭,১২০	৫৯,৭০০	৫৬৮০	৩,৩৮,০৫০

পরিশিষ্ট-৫
সেচব্যবস্থার অগ্রগতি

রবি শস্য

(সেচক্ষেত্র-হেক্টর)

সাল	বর্ধমান	বাঁকুড়া	হুগলি	হাওড়া	মোট
১৯৬৪-৬৫	৬৯৯৫	—	৮৩৩৪	২৪৯	১৫৫৭৮
১৯৬৫-৬৬	৭৭২৫	—	৯২০৩	২৭৬	১৭২০৪
১৯৬৬-৬৭	৭৮৬৮	—	৯৩৭৩	২০৮	১৭৫২৩
১৯৬৭-৬৮	৯৯৭৫	—	১২৯৪৮	৩৬৭	২৩২৯১
১৯৬৮-৬৯	৯৯৪৩	২২৫	৯১১৭	২৮৪	১৯৫৬৯
১৯৬৯-৭০	৯৯৭২	১৪৩	১০৪০৮	২৮৫	২০৮০৮
১৯৭০-৭১	৯৭৯৪	১৫৪	৮৬৪৪	২৮৮	১৮৮২০
১৯৭১-৭২	১০১৩৪	২৯৬	৮৫৪৬	২১৮	১৯১৯৪
১৯৭২-৭৩	৯১২০	৫৬৮	৭৬৭৩	১৫৬	১৭৫১৭
১৯৭৩-৭৪	১০৬৫৭	৬০৭	৭৪৪৩	১৭৬	১৮৮৮৩
১৯৭৪-৭৫	১১৫৩৮	৯৩৫	৭২৭০	১৭৩	১৯৯১৬
১৯৭৫-৭৬	১১৫০৭	১১৩০	৭২৮৮	১৯৫	২০১১৭
১৯৭৬-৭৭	১২১৮৬	১১৫৮	৭১২৮	১৫৩	২০৬২৫
১৯৭৭-৭৮	১২৫৩৯	৮০৫	৭১৪৪	১৫২	২০৬৪০
১৯৭৮-৭৯	১২৭৯৭	৮৮৯	৭৭৪৬	১৯০	২১৬২২
১৯৭৯-৮০	—	—	—	—	—
১৯৮০-৮১	৯৭০৭	৫১২	৭০৩৪	২৫২	১৭৫০৫
১৯৮১-৮২	৬৯৭৪	২৮৩	৭০৭৭	—	১৪৩৩৪
১৯৮২-৮৩	৭১১৪	৯২	৬০৫৮	—	১৩২৬৪
১৯৮৩-৮৪	৮৫৬৩	—	৬৯২৪	—	১৫৪৮৭
১৯৮৪-৮৫	৮০০০	১২৩	৬৯৮৩	—	১৫১০৬
১৯৮৫-৮৬	৮১১০	১২০	৭০৩৬	—	১৫২৬৬
১৯৮৬-৮৭	৭৪১৭	১৭৭	৭৩১৭	১৮৮	১৫০৯৯
১৯৮৭-৮৮	৭৪৭৪	৩৭৩	১০৩৮৩	২১৯	১৮৪৪৯
১৯৮৮-৮৯	৭৭৮৪	১৮৮	৮১০৫	২১৯	১৬২৯৬
১৯৮৯-৯০	৮৩১০	২৯২	৮৭৭০	২১৯	১৭৫৯১
১৯৯০-৯১	৭৯৩৮	—	৮৭৬৪	২৫৪	১৬৯৫৬
১৯৯১-৯২	৮০১৬	—	৮৯০৬	৪০৫	১৭৩২৭
১৯৯২-৯৩	৮৩৪৫	—	৮১৩৭	১৯২	১৬৬৭৪
১৯৯৩-৯৪	৮৩৪৫	—	৮৮০৭	২৫৭	১৭৪০৯
১৯৯৪-৯৫	৭৯০৩	—	৮৭৯০	২৫৭	১৬৯৫০
১৯৯৫-৯৬	৮১৯৬	—	৯৩৯২	৩৫৮	১৭৯৪৬
১৯৯৬-৯৭		—			
১৯৯৭-৯৮	৮২৭৫	—	৯১২৭	৪২২	১৮৪২৪
১৯৯৮-৯৯	৮৩২০	৪২০	৯৮৮০	—	১৮৬২০

পরিশিষ্ট-৬

সেচব্যবস্থার অগ্রগতি

বোরো ধান

(সেচক্ষেত্র-হেক্টর)

সাল	বর্ধমান	বাঁকুড়া	হুগলি	হাওড়া	মোট
১৯৬৪-৬৫	—	—	—	—	—
১৯৬৫-৬৬	—	—	—	—	—
১৯৬৬-৬৭	৯১	২০৮	—	—	২৯৯
১৯৬৭-৬৮	—	—	—	—	—
১৯৬৮-৬৯	২৯৯৩	—	৪৬৯৫	৪৫৫	৮১৪৩
১৯৬৯-৭০	৪৪৩০	—	৪৬৭২	৮০	৯১৮২
১৯৭০-৭১	১৩৫৩৭	২	১৪৬০৪	২২৩	২৮৩৬৬
১৯৭১-৭২	৩৬৯০৬	১৭৫	২৮৯৮৭	৬৫১	৬৬৭১৯
১৯৭২-৭৩	২৩৪২২	১২২	৯৯২০	—	৩৩৪৬৪
১৯৭৩-৭৪	৩৮২১৬	৩৯৮	২৫৭০৬	২১৩	৬৪৫৩৩
১৯৭৪-৭৫	৫০৯১৩	৩৪২	২৫৮৬৩	৪৩	৭৭১৬১
১৯৭৫-৭৬	৫২৬৮৩	৫০৯	২১২৮০	১৬	৭৪৪৮৯
১৯৭৬-৭৭	১১৯১০	৭৮৬	৫৭৪০	২	১৮৪৩৮
১৯৭৭-৭৮	৩১৭৮২	১২৬১	১২৩১৮	—	৪৫৩৬১
১৯৭৮-৭৯	৭১৩৩৭	৩৮৮৭	৩০৭৪৯	৮৮৫	১,০৬,৮৫৮
১৯৭৯-৮০	—	—	—	—	—
১৯৮০-৮১	৫৮২৪১	৩১৩৫	১৮২৪৭	৯৯	৭৯৭২২
১৯৮১-৮২	—	১৪০৭	—	—	১৪০৭
১৯৮২-৮৩	—	১৪৩	—	—	১৪৩
১৯৮৩-৮৪	৩১৩৪০	৪৯১৯	৯৮৭০	—	৪৬১২৯
১৯৮৪-৮৫	৩১৮৫৮	৩৮৮৪	৬৮৩০	—	৪২৫৭২
১৯৮৫-৮৬	৩১৮৮০	৩৮৮৬	৬৮৮৩	—	৪২৬৪৯
১৯৮৬-৮৭	৪২৬৪২	৬৬৪৬	১১৩৫৬	—	৬০৬৪৪
১৯৮৭-৮৮	৪৮১৬৮	৬৩২১	৮১৫৩	—	৬২৬৪২
১৯৮৮-৮৯	২৭৫৫৯	৪৫২৮	৮৯৫	—	৩২৯৮২
১৯৮৯-৯০	৩৬১৫৪	৬৬১২	৪০৫২	—	৪৬৮১৮
১৯৯০-৯১	৪৯২৪৪	৯৪৬৫	৭২৫৪	—	৬৫৯৬৩
১৯৯১-৯২	৪২৭১৪	১০২৫৯	৬০৭৩	—	৫৯০৪৬
১৯৯২-৯৩	—	—	—	—	—
১৯৯৩-৯৪	৫৩৪০২	—	৫২৭০	—	৬৯৭৯৩
১৯৯৪-৯৫	৫৫৭১০	—	৫২৭০	—	৬০৯৮০
১৯৯৫-৯৬	৫৭৩২২	১২৪৪৪	৯১৩৭	—	৭৮৯০৩
১৯৯৬-৯৭	৪৮৫৬৪	—	—	—	৪৮৫৬৪
১৯৯৭-৯৮	৩৪৪১৩	৭২৮৯	৮০৯৭	—	৪৯৭৯৭
১৯৯৮-৯৯	৪৭৩৮০	৮৩৪০	৯১১০	—	৬৪৮৩০

লেখক : অবসরপ্রাপ্ত মুখ্য বাস্তুকার

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সেচ ও জলপথ দপ্তর কর্তৃক নির্মিত ১৯টি পাম্পবিশিষ্ট একটি ড্রেনেজ পাম্পিং স্টেশনের শুভ উদ্বোধন

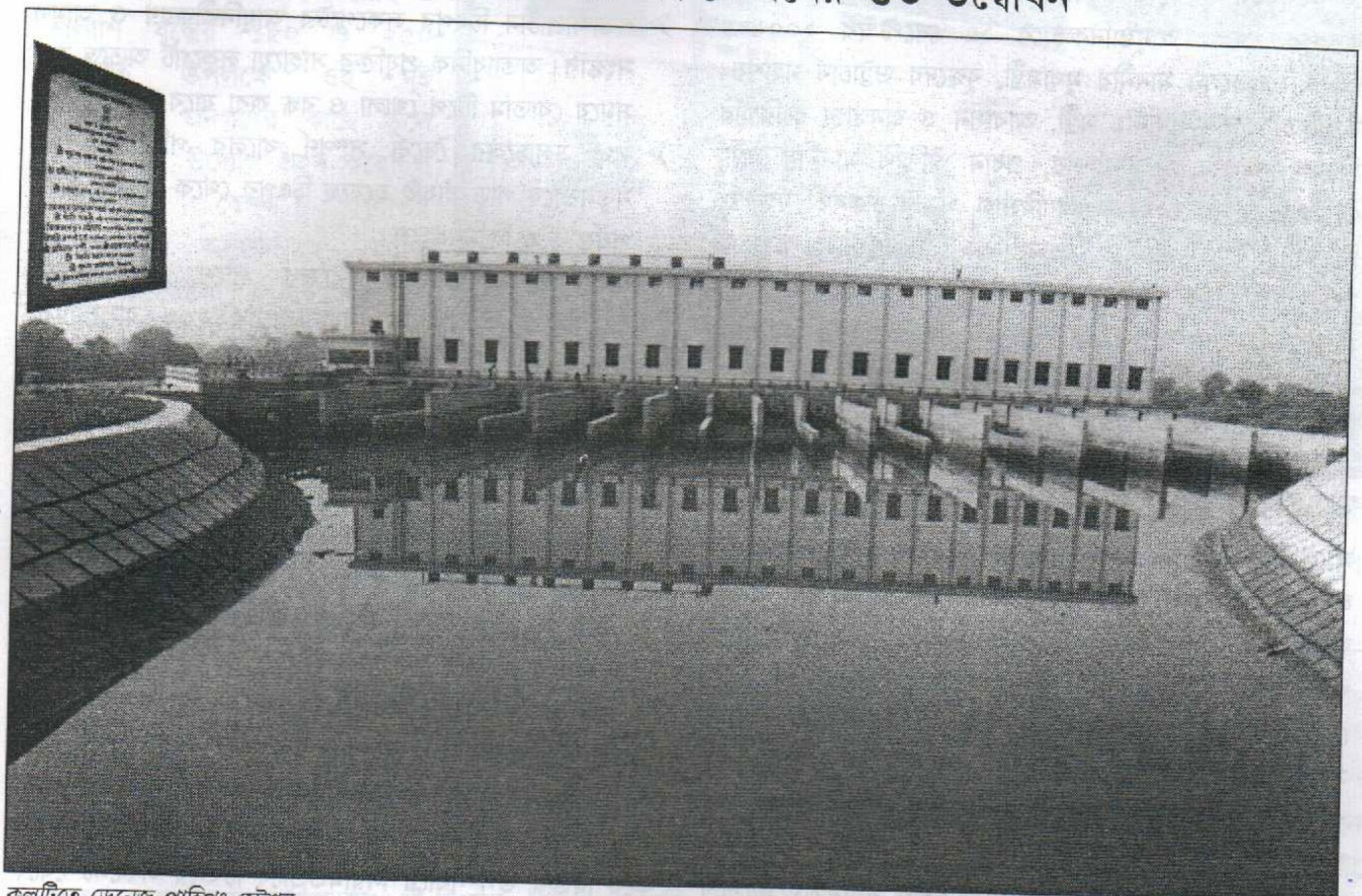

কুলটিতে ড্রেনেজ পাম্পিং স্টেশন

ছবি : অসীম ভট্টাচার্য

উত্তর ও উত্তর-পূর্ব কলকাতা এবং তৎসংলগ্ন পৌর এলাকাগুলির জলনিকাশি ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার কুলটিতে বাগজোলা খালের শেষপ্রান্তে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সেচ ও জলপথ দপ্তর কর্তৃক নির্মিত ১৯টি পাম্পবিশিষ্ট একটি ড্রেনেজ পাম্পিং স্টেশনের শুভ উদ্বোধন হল ২২ ফেব্রুয়ারি, ২০০৬ বুধবারে। উক্ত পাম্পহাউসটির শুভ উদ্বোধন করেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অর্থমন্ত্রী মাননীয় ড. অসীমকুমার দাশগুপ্ত মহাশয়। ওই উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মাননীয় গৌতম দেব, উপস্থিত ছিলেন ভূমি ও ভূমিরাজস্ব দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মাননীয় আব্দুর রেজ্জাক মোল্লা, সুন্দরবন বিষয়ক দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী কান্তি গাঙ্গুলি, কলকাতা পুরসভার মহানাগরিক মাননীয় বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য, উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলা পরিষদের সভাধিপতি মাননীয়া অপর্ণা গুপ্ত, সাংসদ মাননীয় অমিতাভ নন্দী, সাংসদ মাননীয় অজয় চক্রবর্তী, বিধায়ক মাননীয় ক্ষিতিরঞ্জন মণ্ডল এবং মাননীয় বাদল জমাদার মহাশয়। এ ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন মাননীয় সচিব, সেচ ও জলপথ বিভাগ, মাননীয় মুখ্যবাস্তুকারবৃন্দ সহ সেচ ও জলপথ দপ্তরের মাননীয় আধিকারিকবৃন্দ, বিভিন্ন উপস্থিত সম্মানীয় জনপ্রতিনিধিবর্গ এবং বিশিষ্ট নাগরিকবৃন্দ।

সমগ্র অনুষ্ঠানটির সভাপতিত্ব করবেন সেচ ও জলপথ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মাননীয় সুভাষ নস্কর মহাশয়।

এই পাম্পিং স্টেশন নির্মাণের ফলে কলকাতার উত্তর ও উত্তর-পূর্ব অংশ ও কলকাতা এবং তৎসংলগ্ন পৌর এলাকাগুলির জলনিকাশি খালসমূহের যা বাগজোলা খালের সঙ্গে যুক্ত সেসব খালসমূহের জলপ্রবাহ অটুট থাকবে। দীর্ঘ দিনের নিকাশি খালগুলির সমস্যার সমাধানে জনগণের আকাঙ্ক্ষা পূরণ হল।

সার্কুলার-নিউকাট-কৃষ্ণপুর খালে শতাব্দীপ্রাচীন নৌ-পরিবহন ব্যবস্থার পুনরুজ্জীবন

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের সমবেত প্রচেষ্টায় এবং HIDCO (হিডকো)-এর সক্রিয় সহযোগিতায় শতাব্দীপ্রাচীন নৌ-পরিবহন ব্যবস্থার পুনরুজ্জীবন হল সার্কুলার-নিউকাট-কৃষ্ণপুর খালে। আনুষ্ঠানিকভাবে ২৭ সেপ্টেম্বর ২০০৬-এ উদ্বোধন করলেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য মহাশয়। উপস্থিত ছিলেন মাননীয় মন্ত্রী, আবাসন ও জনস্বাস্থ্য কারিগরি বিভাগ, গৌতম দেব মহাশয়, প্রধান অতিথি মাননীয় মন্ত্রী, পরিবহন, ক্রীড়া ও যুবকল্যাণ বিভাগ, সুভাষ চক্রবর্তী মহাশয়, বিশেষ অতিথি মাননীয় মহানাগরিক, বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য মহাশয়, মাননীয় সচিব, সেচ ও জলপথ বিভাগ, মাননীয় মুখ্যবাস্তুকারবৃন্দ সহ সেচ ও জলপথ দপ্তরের মাননীয় আধিকারিকবৃন্দ, বিভিন্ন উপস্থিত সম্মানীয় জনপ্রতিনিধিবর্গ এবং বিশিষ্ট নাগরিকবৃন্দ। সেচ সচিবের সংক্ষিপ্ত ভাষণে সংশ্লিষ্ট খালের ইতিহাস ও পরবর্তী কর্মধারা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন ১৮২৮ সালে খনিত হয় সার্কুলার-বেলেঘাটা খাল, ১৮৫৬-৫৯ সালে নিউকাট খাল, ১৮৮৩ সালে নতুন করে তৈরি হয় চিৎপুর লকগেট, ১৯১০ সালে কেষ্টপুর খাল। সার্কুলার-নিউকাট-ভাঙরকাটা হয়ে বিদ্যাধরী, কলাগাছিয়া ও বিভিন্ন পূর্বমুখী নদী ও খালপথ দিয়ে নৌকা চলে যেত খুলনার বসন্তপুরে, এই পথ প্রচলিত ছিল 'ইনার সুন্দরবন রুট' নামে। স্বাধীনতার পরে বিভিন্ন কারণে এই পরিবহন ব্যবস্থা ক্ষয়িষ্ণু হয়ে পড়ে ও ৮০-র দশকের শুরুতে বন্ধ হয়ে যায়।

২০০৪ সালের অক্টোবর মাসে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে তৎকালীন স্বরাষ্ট্র সচিবের তথা অধুনা মুখ্যসচিবের পৌরোহিত্যে যে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি সার্কুলার-নিউকাট-কৃষ্ণপুর-ভাঙরকাটা খালের পুনরুজ্জীবনের লক্ষ্যে গঠিত হয়, সেই কমিটির সুপারিশক্রমে নিম্নলিখিত পরিকল্পনাসমূহ গৃহীত হয়েছিল।

(ক) খালসমূহকে নৌ-পরিবহনযোগ্য করার জন্য প্রয়োজনীয় সংস্কার ও পাড় বাঁধাইয়ের কাজ করা

(খ) হুগলি নদী দিয়ে জোয়ারের জল খালে প্রবেশ করিয়ে নির্মীয়মাণ রাজারহাট উপনগরী ও বিধাননগরের পানীয় জলের ব্যবস্থা করা

(গ) বিভিন্ন দপ্তরের মাধ্যমে সমন্বয় সাধন ঘটিয়ে নিকাশি নর্দমাগুলি যাতে দূষিত জল খালে ফেলতে না পারে তার ব্যবস্থা করা

(ঘ) খালের দুপাড়ের সৌন্দর্যায়ন করে সামগ্রিক পরিবেশ উন্নয়ন ও পর্যটনের প্রসার ঘটানো।

প্রথম পর্যায়ে লঞ্চ চালানোর পরিকল্পনা চিৎপুর লকগেট থেকে রাজারহাট পর্যন্ত এবং প্রথম উপ-পর্যায়ে ২০০৬-এর নভেম্বর মাস পর্যন্ত চিৎপুর থেকে বৈশাখী পর্যন্ত লঞ্চ চলবে। এই লঞ্চ চালানোর লক্ষ্যে সেচ দপ্তর যে যে কাজ করছে ও করেছে সেগুলি হল :

- শতাব্দীপ্রাচীন চিৎপুর লকগেটের আধুনিকীকরণ ও আমূল সংস্কার। অত্যাধুনিক প্রযুক্তির সাহায্যে লকগেট অত্যন্ত অল্প সময়ে বোতাম টিপে খোলা ও বন্ধ করা যাবে।
- লঞ্চ চলাচলের দৈর্ঘ্যে সম্পূর্ণ খালের পলি নিষ্কাশন। নতুনভাবে পাড় বাঁধাই হয়েছে চিৎপুর থেকে গজনবী সেতু পর্যন্ত ১.৩ কিমি অংশে।
- চিৎপুরে, আর জি কর ব্রিজের পাশে, উল্টোডাঙায়, লেকটাউনে, বৈশাখীতে, বিধাননগরের ২০৬ বাসস্ট্যান্ডে, নয়াপট্টি বাজার এবং রাজারহাটে অর্থাৎ মোট আটটি জায়গায় চলছে দুপাশের যাত্রীদের জন্য জেটি তৈরির কাজ।
- পথচারীদের খাল পারাপারের সুযোগ করে দিতে পাঁচটি জায়গায়—গোলাঘাটায়, বৈশাখীতে, ২০৬ বাসস্ট্যান্ডের কাছে, কেষ্টপুরের মিশন বাজারের কাছে এবং নয়াপট্টিতে চলছে স্টিল ফুট ব্রিজের কাজ। ভি আই পি দমদম পার্ক স্টপে এবং বিধাননগরের দিগন্তিকায় আরও দুটি স্টিল ব্রিজের নির্মাণ অবিলম্বেই শুরু করা হবে।

তিনি আরও বলেন আগামী নভেম্বর পর্যন্ত লঞ্চ চালানোর অর্জিত অভিজ্ঞতার পর্যালোচনা করে ২০০৬-এর ডিসেম্বর থেকে ২০০৭ সালের জুন মাস পর্যন্ত খালের পরবর্তী পর্যায়ের সংস্কার, পাড় বাঁধাইয়ের উন্নতিকরণ ও সম্প্রসারণের কাজগুলি সমাপ্ত করে দ্বিতীয় উপ-পর্যায়ে নিয়মিতভাবে চিৎপুর লকগেট থেকে রাজারহাট পর্যন্ত মোট ১৩.৫০ কিমি দৈর্ঘ্যে লঞ্চ চলবে।

দ্বিতীয় পর্যায়ে লঞ্চ পরিষেবা রাজারহাট ছাড়িয়ে আরও পূর্বদিকে হাড়োয়াগাঙ নদী (কুলটি) পর্যন্ত সম্প্রসারণের পরিকল্পনা আছে।

প্রথম উপ-পর্যায়ের চালু কাজের প্রায় ১৭ কোটি টাকা এবং দ্বিতীয় উপ-পর্যায়ের পরিকল্পিত কাজের মূল্য প্রায় ৬ কোটি টাকা। এই পুরো অর্থ হিডকো কর্তৃপক্ষ প্রদান করবে বলে প্রতিশ্রুত হয়েছে। তিনি তাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানায়।

পাশাপাশি তিনি উল্লেখ করেন যে, প্রায় গোটা কলকাতা শহর, উত্তর শহরতলি ও পূর্বপ্রান্তে গড়ে ওঠা রাজারহাট উপনগরীর ও তৎসংলগ্ন নির্মীয়মাণ নগরায়নের সমস্ত অংশের নিকাশি ব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে কুলটিগাঙ (বিদ্যাধরী) নদীর উপরে নির্ভরশীল। বিগত দু-তিন দশক ধরে দেখা যাচ্ছে বিভিন্ন জায়গায় পলি জমার কারণ নদীর বহন ক্ষমতা ক্রমশই কমছে। ফলে অদূর ভবিষ্যতে নদীর পলি উত্তোলন তথা সংস্কারের বিষয়টি অতীব গুরুত্ব পেয়েছে।

হেরিটেজ বেঙ্গল আয়োজিত কলকাতার রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়ামের 'ভারত ক্রান্তি উৎসব'

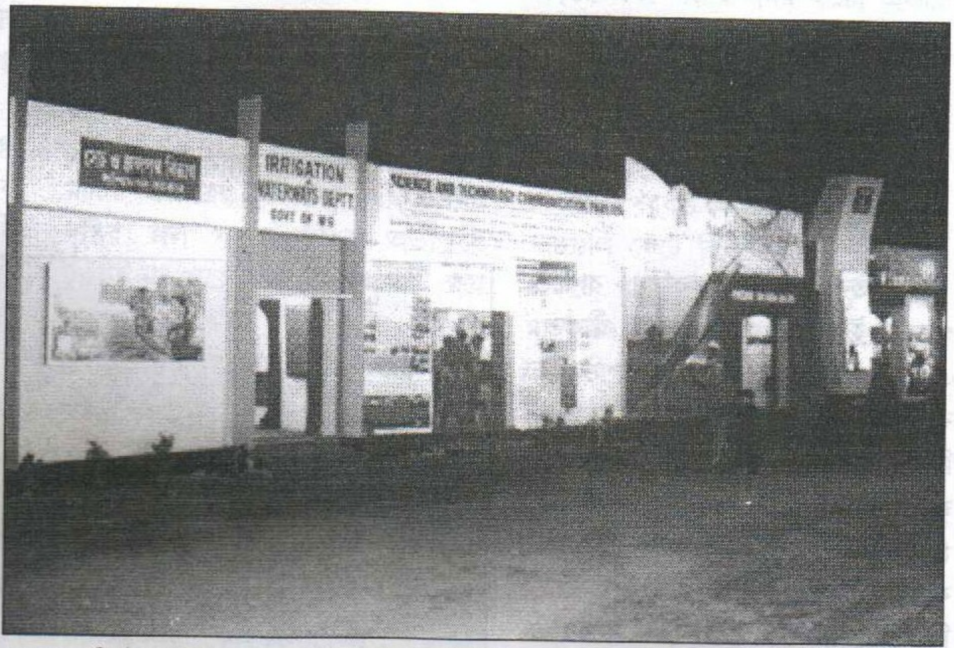

ভারত ক্রান্তি উৎসবে সেচ ও জলপথ বিভাগের প্যাভিলিয়ন *ছবি : দিলীপ কর্মকার*

গত ১৯ থেকে ২৮ জানুয়ারি ২০০৭ কলকাতার রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়ামে উদ্‌যাপিত হল 'ভারত ক্রান্তি উৎসব'। সিপাহি বিদ্রোহ ও পলাশি যুদ্ধের ১৫০ ও ২৫০ বর্ষপূর্তি উপলক্ষে ওই দুই ক্রান্তিকাল জনগণের কাছে তুলে ধরার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করেছিল 'হেরিটেজ বেঙ্গল'। বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান-সহ বর্ণাঢ্য প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয় এই উৎসবে। বলা বাহুল্য, অন্যান্য কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের বিভাগগুলির পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সেচ ও জলপথ বিভাগ এই মেলাতে অংশগ্রহণ করে। রাজ্যের সেচ ব্যবস্থা ও বন্যা নিয়ন্ত্রণে দপ্তরের বিভিন্ন কর্মধারা জনসমক্ষে তুলে ধরা হয় বিভিন্ন মডেলের মাধ্যমে। বহু মানুষের সমাগমে মেলা প্রাঙ্গণ এক কটা দিন ছিল উৎসব মুখরিত।

সুন্দরবন কৃষ্টি মেলা ও লোকসংস্কৃতি উৎসব, ২০০৬

প্রতি বছরের ন্যায় এবারেও ২০ থেকে ২৯ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হল সুন্দরবন কৃষ্টি মেলা ও লোকসংস্কৃতি উৎসব ২০০৬। মিলনতীর্থ সোসাইটির উদ্যোগে দক্ষিণ চব্বিশ-পরগনা জেলার কুলতলিতে অনুষ্ঠিত হল এই উৎসব। বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান অংশগ্রহণ করেছিল এই মেলাতে। রাজ্যের সেচ ব্যবস্থা ও বন্যা নিয়ন্ত্রণে দপ্তরের বিভিন্ন কর্মধারা জনসমক্ষে তুলে ধরার জন্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সেচ ও জলপথ বিভাগ এই প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করে। সুন্দরবনের নদীবাঁধ রক্ষণাবেক্ষণের কর্মধারা কিছু প্রদর্শনী সামগ্রীর মাধ্যমে প্রদর্শিত করা হয়। এই মিলন মেলাতে সুন্দরবনের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষের সমাগমে ওই কটা দিন মেলা প্রাঙ্গণ জনজোয়ারের রূপ নেয়।

ত্রিদিব নগর সন্নিহিত বিদ্যানদীর বাঁধ ও স্লুইস গেট নির্মাণ প্রকল্পের শিলান্যাস

এলাকার বহুদিনের আকাঙ্ক্ষিত প্রকল্প ত্রিদিব নগর সন্নিহিত বিদ্যানদীর বাঁধ ও স্লুইস গেট নির্মাণের শিলান্যাস হল ৬ ফেব্রুয়ারি, ২০০৬। প্রকল্পের শিলান্যাস করেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কারা, সমাজকল্যাণ ও নারী শিশু উন্নয়ন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী বিশ্বনাথ চৌধুরী মহাশয়। উক্ত সভাতে উপস্থিত ছিলেন সুন্দরবন বিষয়ক দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী কান্তি গাঙ্গুলি, মাননীয় সাংসদ সনৎকুমার মণ্ডল, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলা পরিষদের সহ-সভাধিপতি মাননীয় নিমাই বর্মণ, এই জেলার কৃষি, সেচ ও সমবায়ের কর্মাধ্যক্ষ জগন্নাথ হালদার, বাসন্তী পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি কল্পনা দাস সহ সেচ ও জলপথ বিভাগের মাননীয় বিভিন্ন আধিকারিক ও স্থানীয় সম্মানীয় জনপ্রতিনিধিবর্গ এবং বহু বিশিষ্ট নাগরিকবৃন্দ।

সমগ্র অনুষ্ঠানটি পৌরোহিত্য করেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সেচ ও জলপথ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী সুভাষ নস্কর মহাশয়। এই নির্মাণে সংলগ্ন এলাকাবাসীর চাহিদা যেমন পূরণ হবে, সঙ্গে সঙ্গে বিশাল এলাকার উন্নয়নে আর এক ধাপ এগিয়ে যাবে।

বনসৃজন যখন সমস্যা

গোবিন্দলাল ব্যানার্জী

প্রকৃতির ভারসাম্য বজায় রাখতে গাছের উপস্থিতি আজ বহুল স্বীকৃত। একের পর এক গাছ কেটে ফেলে, বনানীকে ধ্বংস করে আধুনিক সভ্যতার বিকাশ ঘটাতে শিল্পায়ন, নগরায়ন, জলাধার নির্মাণ প্রভৃতির মাধ্যমে আমরা প্রকৃতির ভারসাম্য নষ্ট করে ফেলছি, এতে কারও দ্বিমত নেই। পাশাপাশি জন-বিস্ফোরণের জায়গা করে দিতে ও বনজঙ্গল কেটে বসতি তৈরিতেও আমরা বাধ্য হয়েছি ; কিন্তু তখন প্রকৃতির ভারসাম্যর কথা কারও মাথায় আসেনি। কারণ বিশাল প্রকৃতির অঢেল ধনভাণ্ডার থেকে একটু একটু করে সম্পদ লুট করে সভ্যতা প্রতিষ্ঠার আনন্দে মশগুল হয়ে থাকায়। প্রকৃতিকে নিয়ে ভাববার অবকাশটুকুও অনুভব করিনি। বিজ্ঞান আর প্রযুক্তির গর্বে অন্ধ হয়ে, প্রকৃতিকে জয় করার আনন্দে কি বিরাট ক্ষতিসাধন করেছি তা বোঝার চাহিদা বা জানার ইচ্ছাও প্রকাশ পায়নি। তাই রুষ্ট প্রকৃতি বদলা নেবার কাজ শুরু করেছে তখন থেকেই। প্রকৃতির বিশালত্বের কার্যকারণ প্রকৃতির নিরিখে এতই কম যে প্রকৃতিবিদ্‌দেরও চোখে পড়েনি। বহুদিন ধরে একটু একটু করে ফল যখন অনেক জমেছে, তখন টনক নড়েছে বিজ্ঞানী, সমাজবিদ্‌ ও প্রকৃতিবিদ্‌দের।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষে এসে ভুল ধরা পড়েছে। দূষণে পরিপূর্ণ হয়ে গেছে গোটা পৃথিবী আর সেই দূষণকে হাতিয়ার করে প্রকৃতিও খেপে উঠেছে নানা মারণাস্ত্র নিয়ে মানব-সভ্যতাকে চরম আঘাত করতে। প্রকৃতির শাসনকে না মেনে সভ্যতা যে শাসন নিজের হাতে তুলে নিয়েছিল তার ফলস্বরূপ জন্ম নিয়েছে

নিম্ন-দামোদরের থালিয়া বাক্‌সী শর্টকার্ট খালের বাঁধ

প্রাকৃতিক অরাজকতা, প্রাকৃতিক নৈরাজ্য। কারণ প্রকৃতির শাসনের পরিকাঠামো, আইনের, নিয়মের পরিকাঠামো সব এলোমেলো হয়ে গেছে। সভ্যতার জন্মলগ্নেও প্রকৃতির যে নিয়ম-শৃঙ্খলাকে মানুষ প্রত্যক্ষ করেছে, আজ তা অবসৃত। ঋতুচক্র পাল্টে যাচ্ছে। শীতের সময় ঠাণ্ডা নেই, বর্ষায় বৃষ্টির দেখা নেই। নদীমাতৃক ও শস্যশ্যামলা বাঙলা খরাপ্রবণ হয়ে যাচ্ছে। গ্রীষ্মকালে যেখানে গড় তাপমাত্রা ২৫° থেকে ৩৫°-৩৬° সেলসিয়াসে ওঠা-নামা করতো এখন সেখানে মাসাধিককাল ৪০° সেলসিয়াসের ওপর চুক্তিবদ্ধ হয়েছে। মরুভূমির দেশ, কম বৃষ্টিপাতের দেশগুলি হঠাৎ হঠাৎ বন্যার কবলে পড়ছে। যে 'সুনামির' নাম ভারতবর্ষ কোনোদিন শোনেনি, সেই 'সুনামি' আছড়ে পড়েছে ভারতবর্ষের উপকূলে। ছিনিয়ে নিয়েছে লক্ষ মানুষের প্রাণ ; তছ্নছ্ করেছে মানব-সভ্যতাকে। প্রকৃতির সৃষ্ট জীব-জগৎ আজ অনেকাংশেই লুপ্তপ্রায়। বিভিন্ন প্রকার জলবায়ু এবং বৈচিত্র্যময় ভৌগোলিক অবস্থা অনুযায়ী বিভিন্ন দেশীয় গাছপালা ও বিভিন্ন জাতের পশু-পাখি, জীবজন্তু সৃষ্টি করেছিল প্রকৃতিই তার নিজস্ব চাহিদা অনুযায়ী। আমরা সভ্য মানুষ প্রকৃতির গঠনশৈলীর কথা চিন্তা না করেই কেটে ফেলেছি সেইসব দেশীয় গাছপালা ও বনানী আর তাদের সাথে সম্পর্ক জড়িয়ে যেসব জীবজন্তু ও পশুপাখি এতদিন প্রকৃতির কর্মকাণ্ডের অংশীদার ছিল তারাও ধ্বংসপ্রাপ্ত। প্রকৃতিও তাই ক্ষিপ্ত হয়ে একের পর এক তাণ্ডবলীলায় মেতে উঠেছে।

এতসব দেখে ও বুঝে সভ্য মানুষ এখন বুঝতে পারছে ভুল হয়েছে, অন্যায় হয়েছে অনেক। পুরো প্রায়শ্চিত্ত করতে না পারলেও যদি প্রকৃতির আগের সেই রূপকে কিছুটা অন্তত ফিরিয়ে দেওয়া যায়, কিছুটা প্রায়শ্চিত্ত করেও যদি প্রকৃতির

কোপকে ঠেকানো যায় তারই প্রচেষ্টায় সভ্য মানুষের প্রয়াস গোটা পৃথিবী জুড়ে। এবং এই প্রয়াসের অন্যতম প্রধান কাজ প্রকৃতির বনভূমিকে যতটা সম্ভব আগের চেহারায় পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা।

আর সমস্যাটাই এখান থেকে শুরু। বনসৃজন বা বনানী গঠন কিভাবে হবে, কোন পথে হবে, কোন জায়গায় কি ধরনের গাছ লাগানো হবে এ সবেরই মধ্যে সুষ্ঠু চিন্তা-ভাবনার অভাব থেকে যাচ্ছে। জলবায়ু এবং ভূপ্রকৃতির গঠনের সঙ্গে মানানসই করেই বিভিন্ন ধরনের গাছপালার জন্ম দিয়েছে প্রকৃতি। বাংলাদেশের গাছ রাজস্থান-বিহারে সচরাচর চোখে পড়ে না। আবার পাহাড়ি অঞ্চলের গাছও সমতলে দেখা যায় না। কিন্তু দেখা যাচ্ছে এই নিয়ম ঠিক- ঠিকভাবে পালিত হচ্ছে না। বন-সৃজনের নামে বিদেশি গাছপালায় ভরে উঠেছে বাংলার প্রকৃতি। আমাদের পূর্বপুরুষরা যে সব গাছপালা কোনোদিন চোখে দেখেনি, সেই সব গাছপালা দিয়ে আমরা বনসৃজন করেছি। এতে হয়তো বনানীর অভাব কিছুটা মিটেছে, কিন্তু পাল্টে যাচ্ছে সেখানকার প্রাকৃতিক পরিবেশ ও জলবায়ু। এ তো গেল পরিবেশের সমস্যা। আরও একটা সমস্যা দেখা দিয়েছে প্রযুক্তিগত ব্যাপারে। এবং তার প্রত্যক্ষ ফল ভোগ করতে হচ্ছে সেচ ও পূর্ত দপ্তরকে।

পশ্চিমবঙ্গে যত সেচখাল, নিকাশি খাল ; বড় বড় নদীর বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য মাটির বাঁধগুলি, এবং পূর্ত দপ্তরের যত রাস্তার ধার সবই এখন বনসৃজনের একমাত্র জায়গা হিসাবে নির্দিষ্ট।

বহু জায়গাতেই এই বনসৃজন হচ্ছে অপরিকল্পিতভাবে এবং যথেচ্ছভাবে। সেচ দপ্তর এবং পূর্ত দপ্তরকে বহু সময়ই অন্ধকারে রেখে এই প্রক্রিয়া অনবরত চলছে। সেচ দপ্তরের যে এতে সমস্যা হতে পারে, প্রযুক্তিগত ব্যাপারে কতটা ক্ষতি হতে পারে সেই চিন্তা-ভাবনার কোনো প্রয়োজন মনে করে না বনসৃজনকারীরা। কি কি এবং কোন ধরনের সমস্যা তৈরি হচ্ছে তার কিছু আলোচনাই এই রচনার মূল উদ্দেশ্য।

যে মাটির বাঁধ জলকে নিয়ন্ত্রণ করে সেই বাঁধের উচ্চতা অনুযায়ী দু-পাশে ঢাল দিতে হয়। কতটা ঢাল দিতে হবে সেটা নির্ভর করে জলের উচ্চতা এবং মাটির চরিত্রের উপর। বর্ষার সময় বৃষ্টির জল যাতে বাঁধের অভ্যন্তরে ঢুকতে না পারে এবং ঢালের মাটি ক্ষয় না করতে পারে তার জন্য ঘাসের চাপড়া বসানো হয়। অথবা ভূমিক্ষয় থেকে বাঁচাতে ছোট ছোট গুল্মজাতীয় গাছ লাগানো যেতে পারে যাদের শিকড় মাটির উপরিভাগে অর্থাৎ ২-৩ ইঞ্চির মধ্যে সীমাবদ্ধ।

একটা সময় ছিল সেচ দপ্তরের বাঁধে একটা গরু ওঠারও অনুমতি দেওয়া হত না এবং জনসাধারণ সেই আইনকে মান্য করত। স্বভাবতই বাঁধের রক্ষণা-বেক্ষণে যখন-তখন টাকা-পয়সা খরচ করারও প্রয়োজন হত না। বাঁধের উপরে বা ঢালে বড় গাছ লাগানো একেবারেই বারণ ছিল ; ঝোপ-ঝাড়জাতীয় গাছ যথা ; বনকল্মী, শিঁয়াকুল প্রভৃতি গাছ লাগানো হতো ভূমিক্ষয়কে আটকানোর জন্য।

কিন্তু ইদানীংকালে বাঁধের ঢালে বড় বড় গর্ত করে ইউক্যালিপ্টাস্, আকাশমণি, বাবলা, সোনাঝুরি, শিশু ইত্যাদি বৃহদাকার জাতীয় গাছ লাগানো হচ্ছে, অনেক ক্ষেত্রেই সেচ দপ্তরের অনুমতি ছাড়াই। এই জাতীয় বড় বড় গাছ লাগানোয় জন্য যে সমস্যা হচ্ছে তা হল—

(১) এই গাছগুলির শিকড় মাটির বাঁধের মধ্যে বিস্তার লাভ করে নদীর বা খালের জল টানছে। ফলস্বরূপ গোটা বাঁধটাই সম্পৃক্ত (Saturated) হয়ে পড়ছে এবং ওইসব শিকড়ের গা বেয়ে জল চুঁইয়ে ঘোগের সৃষ্টি করছে। এই সকল ঘোগ বর্ষার সময় বা বন্যার সময় ভাঙন সৃষ্টি করে রাস্তাঘাট, জনপদ এবং চাষ জমিকে প্লাবিত করছে।

(২) ঝড়-বৃষ্টির সময় ওইসব বড় বড় গাছ বাঁধের সম্পৃক্ত নরম মাটিতে শক্ত হয়ে দাঁড়াতে পারছে না, স্বভাবতই উল্টে পড়ছে এবং পড়ার সময় যতটা অঞ্চলে শিকড় বিস্তার করে দাঁড়িয়েছিল সেই অঞ্চলের সম্পূর্ণ মাটিকে উপড়ে বিশাল বিশাল গর্ত তৈরি করে বাঁধের ভাঙন সৃষ্টি করছে।

(৩) পরবর্তীকালে ওই সব বড় বড় গাছগুলি কেটে বিক্রি করার পর, পড়ে থাকছে গাছের গুঁড়ির অংশটুকু। গরিব মানুষজন জ্বালানির অভাব মেটাতে বাঁধের ঢালে বিশাল গর্ত করে গুঁড়িগুলোকে তুলে নিচ্ছে এবং গর্তটা না বুজিয়ে ফেলে রাখছে—পরবর্তীকালে ভাঙনের পথ তৈরি করতে।

(৪) অনিয়ন্ত্রিত গরু-মহিষের পাল গোচারণ ক্ষেত্রের অভাবে একমাত্র চারণভূমি করেছে নদীবাঁধকে। তাদের ক্ষুরের আঘাতে আঘাতে বাঁধের ঢাল ভেঙে যাচ্ছে। কাটা গাছগুলি বহন করার নিমিত্ত ট্রাক্টর, লোহার চাকা লাগানো গরুর গাড়ি যথেচ্ছভাবে বাঁধে ওঠা-নামা করে বিশাল ক্ষতিসাধন করছে।

অনেক চিঠি-পত্রাদি, সভা-সমিতি করেও সেচ দপ্তর এই ব্যবস্থার কোনো পরিবর্তন করতে পারছে না। শত শত মাইলব্যাপী এইসব মাটির বাঁধের রক্ষণাবেক্ষণ করতে প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে হচ্ছে।

এছাড়াও বাঁধের উপর নিবিড় বন-জঙ্গল হওয়ার দরুন খাল-পাড়ের কোনো পরিকল্পনা করার নিমিত্ত যে জরিপের প্রয়োজন হয় (Survey work) গাছপালাগুলি তার বাধা সৃষ্টি করছে।

উপরোক্ত সমস্যাগুলির কথা চিন্তা করে ভবিষ্যতে যাতে সুষ্ঠুভাবে প্রকৃতি, পরিবেশ ও প্রযুক্তিগত দিকগুলির কথা মাথায় রেখে বনসৃজনের মতো অতি প্রয়োজনীয় পরিকল্পনাগুলি গ্রহণ করা ও জনসাধারণের সচেতনতা বৃদ্ধি করানোই এই প্রতিবেদনের মূল বিষয়।

লেখক : নির্বাহী বাস্তুকার, সেচ ও জলপথ দপ্তর

সেচ পরিক্রমা : জেলা বাঁকুড়া

দিলীপ কর্মকার

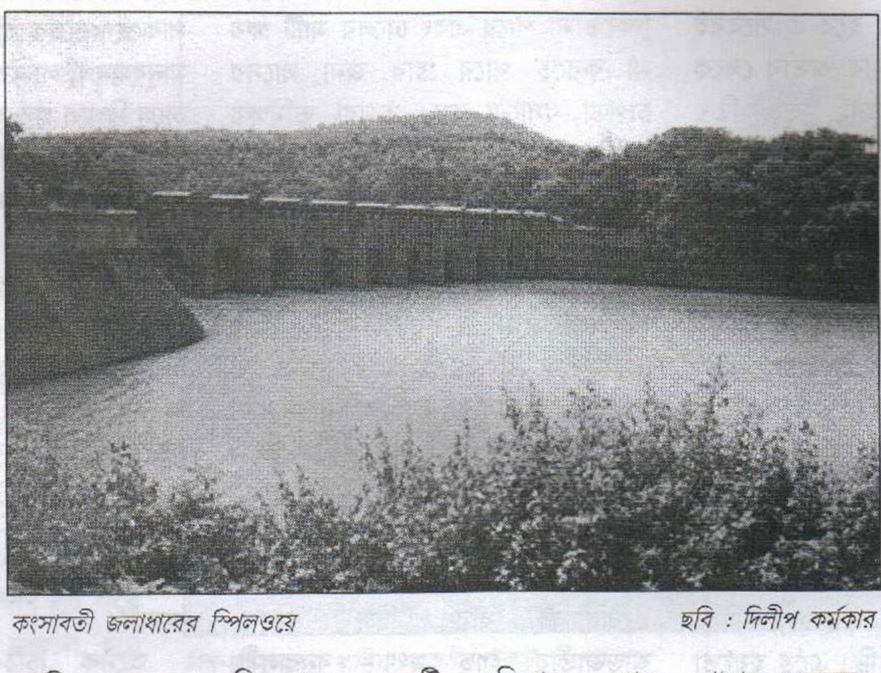

কংসাবতী জলাধারের স্পিলওয়ে *ছবি : দিলীপ কর্মকার*

জেলা বাঁকুড়ার কথা মনে হলে প্রথমেই ভাবচক্ষুতে দৃশত হয় জেলার প্রত্নতত্ত্ব সম্ভারের। এই জেলার বিষ্ণুপুরে পোড়া মাটির স্থাপত্যে সমৃদ্ধ বিভিন্ন সৌধ যা বারে বারে মনকে আকর্ষণ করে। বিভিন্ন স্থাপত্য শিল্পে ও নানা ভাস্কর্যে সমৃদ্ধ মন্দির আছে এই জেলাতে যা বাংলার কৃষ্টির একটি ঘরানা। ঐতিহ্যমণ্ডিত বাংলার কৃষ্টির প্রকৃষ্ট প্রমাণ। কথিত আছে হাজার বছর আগে এই স্থান যে সকল সর্দারের দ্বারা পরিচালিত হতো তাদেরকে বলা হতো বঙ্কু রাই (Banku Rai)। এই নামই পরিবর্তিত ও পরিমার্জিত হয়ে জেলার নাম হয়েছে (বাঁকুড়া)। ভৌগোলিক অবস্থানে এই জেলার দক্ষিণাংশে জেলা মেদিনীপুর, পশ্চিমদিকে জেলা পুরুলিয়া, উত্তর অংশে জেলা বর্ধমান ও পূর্বে হুগলি জেলার কিছুটা অবস্থান। এই জেলা লাল মাটির জেলা। এই লাল মাটি দিয়ে তৈরি ইট, টালি, নানান ভাস্কর্যের বস্তু দ্বারা নির্মিত বিভিন্ন মন্দির হাজার হাজার বছর ধরে বিভিন্ন যুগের সাথী হয়ে আছে। এই লাল মাটি দ্বারা তৈরি লম্বা এখানকার মৃৎশিল্পীরা তৈরি বিভিন্ন আকারের ঘোড়া যা করে কুটির শিল্পের আকারে দেশের অভ্যন্তরে এমনকি বিদেশেও একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। এই শিল্প নৈপুণ্য স্বতন্ত্র। প্রত্নতাত্ত্বিকদের মতে এই সকল স্থাপত্যের মূল্য অসীম। আবহাওয়ার তারতম্য ও সময় মতো সঠিকভাবে রক্ষণাবেক্ষণ না হওয়ার ফলে কিছু কিছু স্থাপত্যের ক্ষয় ঘটেছে আবার কয়েকটির কিছু অংশ ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। এতদসত্ত্বেও যে পুরাতন বাংলার ঐতিহ্যমণ্ডিত কৃষ্টি বিদ্যমান এই জেলাতে তা আমাদের গর্বের।

লাল মাটির জেলা, এখানের মৃত্তিকার সঙ্গে আছে ল্যাটেরাইট, রুক্ষ, শুষ্ক, কাঁকর মিশ্রিত মাটি যা চাষের অনুর্বর। ছোট পাহাড়, টিলা এই জেলাতে বর্তমান। জেলার অংশবিশেষ ১০০ মিটারের বেশি উচ্চতায় মালভূমির দেখা মেলে। বাঁকুড়া জেলার বিহারীনাথ পাহাড় (উচ্চতা ৪৩৯.৬ মিটার) ও শুশুনিয়া পাহাড় (উচ্চতা ৪৪৭.৪ মিটার) বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই সকল পাহাড় ও মালভূমি অঞ্চল, ছোট নাগপুর মালভূমির সঙ্গে যুক্ত। এছাড়া উচ্চতায় ছোটো, সালতোড়া, মেজিয়া, কোরা পাহাড়সহ খাতরা ও রায়পুর অঞ্চলে ও উচ্চতায় কম সুন্দর পাহাড় বর্তমান। এদের মধ্যে মাসাকের পাহাড় অন্যতম। এই জেলার মধ্য দিয়ে কর্কটক্রান্তি রেখা যাবার জন্যে জেলায় গরম বেশি। খরাপ্রবণ এই জেলায় চাষের জন্য জলের প্রয়োজন। জুন মাসে মৌসুমী বায়ুর আগমণে এই জেলাতে বৃষ্টিপাত হয়ে থাকে। সাধারণত এখানের বৃষ্টিপাত কম। ১০০০ মি.মি. থেকে ১৪০০ মি.মি. জেলার বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ। মৌসুমী বায়ু বিলম্বে আগমনে বা বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কম হলে জেলাতে খরার প্রবণতা দেখা দেয়। গ্রীষ্মকালে বেশ গরম থাকে। খরাপ্রবণ হওয়া সত্ত্বেও জেলাতে ১১৮ বর্গ কিমি এলাকা বন্যাপ্রবণ এলাকা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে যা মোট জেলার আয়তনের ১.৭১ শতাংশ।

জেলাতে বিভিন্ন ভাষাভাষী মানুষের বাস। বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী, কৃষ্টির ও সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষ। তফসিলি জাতি ও তফসিলি উপজাতি সম্প্রদায়ভুক্ত

মানুষজনের সংখ্যা এই জেলাতে উল্লেখ্য। আদিবাসীদের মধ্যে সাঁওতাল, বাগদি, রাই প্রভৃতি সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষের বাস এই জেলায় যুগযুগ ধরে। ২০০১ সালে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষিতের হার যেখানে ৬৯.২২ শতাংশ সেখানে বাঁকুড়া জেলায় শিক্ষিতের হার ৬৩.৮৪ শতাংশ। ১৯৭১ সালে জনগণনা থেকে শুরু করলে ২০০৬ সল অবধি শতকরা শিক্ষিতের প্রায় ৩৭.৭৪ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে (সারণী-১) এটা জেলার ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য দিক। প্রাকৃতিক সম্পদের মধ্যে আছে বনাঞ্চল। খনিজ সম্পদে ল্যাটেরাইট, লাইমস্টোন, কয়লা, চিনামাটি ইত্যাদি। এই জেলার ঝিলমিল অঞ্চলে উলফার্ম পাওয়া যায়। এছাড়া এখানে মেলে বিল্ডিং মেটেরিয়াল। এই জেলাতে শালের বনাঞ্চলের প্রাধান্য, এখানে আছে মহুয়া, পলাশ, সজনে, পিপল আবার আছে বাবুল, বেল, বিচুটি বহেড়া ইত্যাদি অনেক গাছ। ঔষধি গাছেরও চাষ হয়ে থাকে এই জেলাতে।

উল্লেখযোগ্য নদীসমূহের মধ্যে জেলাতে আছে সালী, ঢালকিশোর, গন্ধেশ্বরী, কাঁসাই, দেবাই নদী, শিলাই নদী, জয়খাল, হরিণমারি ইত্যাদি। দামোদর নদ বয়ে চলেছে এই জেলার উত্তরাংশে। এই নদ সীমানা নির্ধারিত করেছে জেলা বাঁকুড়া ও বর্ধমান। জেলার দামোদর, গন্ধেশ্বরী, কাঁসাই ও ঢালকিশোর মূল প্রবাহের শাখা-প্রশাখাই অন্যান্য নদীসমূহ। এখানে আছে বৃহৎ জলাভূমি, খাল-বিল, এর মধ্যে শুভঙ্করী খাল, মেজিয়া বিল, জয়মাল ইত্যাদি। কয়েকযুগ আগে এলাকার রাজাদের দ্বারা খনন হয়েছিল একটি সুবৃহৎ পুষ্করিণী। ইদানীং ঐ পুষ্করিণীর জল পরিশুদ্ধ করে স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটি জনগণের পানীয় জলের জোগান দিচ্ছে। এই বিশাল পুষ্করণী রাজবাঁধ নামে পরিচিত।

বাঁকুড়া জেলার মোট আয়তন ৬৮৮২ বর্গকিমি যা সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের ৭.৭৫৪ শতাংশ। আয়তনে রাজ্যের ১৯টি জেলার মধ্যে এই জেলা চতুর্থ স্থানে। জেলাতে জনসংখ্যার তথ্য অনুযায়ী দেখা যায় ১৯০১ সালে জেলাতে জনসংখ্যা ছিল ১১.১৬ লক্ষ। ১৯৭১ সালের জনগণনানুযায়ী জেলার জনসংখ্যা নথিভুক্ত ছিল ২০.৩১ লক্ষ। আর সর্বশেষ ২০০১ সালে জনগণনা অনুযায়ী লোকসংখ্যা হল ৩১.৯১ লক্ষ। পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য জেলার মতো এই জেলাতেও বৃদ্ধি হয়েছে জনসংখ্যার (সারণি-২)।

জেলার জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজন হয় খাদ্যশস্যের। বছরে কয়েকটি ফসল এই রুক্ষ জমিতে অধিক পরিমাণে ফলাতে প্রয়োজন হয় জলের। যেহেতু এই জেলাতে বৃষ্টির জলের পরিমাণ বেশি নয় তাই ওই জল সঠিকভাবে সংরক্ষণ করে চাষের কাজে ব্যবহারের জন্যে পরিকল্পনা করা হয় জলাধারের নির্মাণের। জেলাতে জলাধারগুলির মধ্যে প্রথমেই উল্লেখযোগ্য বৃহৎ প্রকল্পের নাম

সারণি—১

বাঁকুড়া জেলার শিক্ষিত জনগণের হার

শিক্ষিত জনগণের হার, ০—৬ বৎসর শিশু বাদে

জেলা	বৎসর	জনসংখ্যা	মোট সংখ্যা	পুরুষ	মহিলা
বাঁকুড়া	১৯৭১	২০৩১০৩৯	২৬.১০	৩৮.১০	১৩.৯০
	১৯৮১	২৩৭৪৮১৫	৩৮.৩৩	৫১.৯২	২৪.২৪
	১৯৯১	২৮০৫০৬৫	৫২.০৪	৬৬.৭৫	৩৬.৫৫
	২০০১	৩১৯১৮২২	৬৩.৮৪	৭৭.২১	৪৯.৮০

সারণি—২

বাঁকুড়া জেলার জনসংখ্যা

জেলা	জেলার আয়তন (বর্গ কিমি)	বৎসর	জনসংখ্যা			প্রতিবর্গ কিমিতে জনসংখ্যা
			মোট সংখ্যা	পুরুষ	মহিলা	
বাঁকুড়া	৬৮৮২	১৯৭১	২০৩১০৩৯	১০৩৭২৬৭	৯৯৩৭৭২	২৯৫
		১৯৮১	২৩৭৪৮১৫	১২০৮৮৬৭	১১৬৫৯৪৮	৩৪৫
		১৯৯১	২৮০৫০৬৫	১৪৩৭৫১৫	১৩৬৭৫৫০	৪০৮
		২০০১	৩১৯১৮২২	১৬৩৪৫৬১	১৫৫৭২৬১	৪৬৪

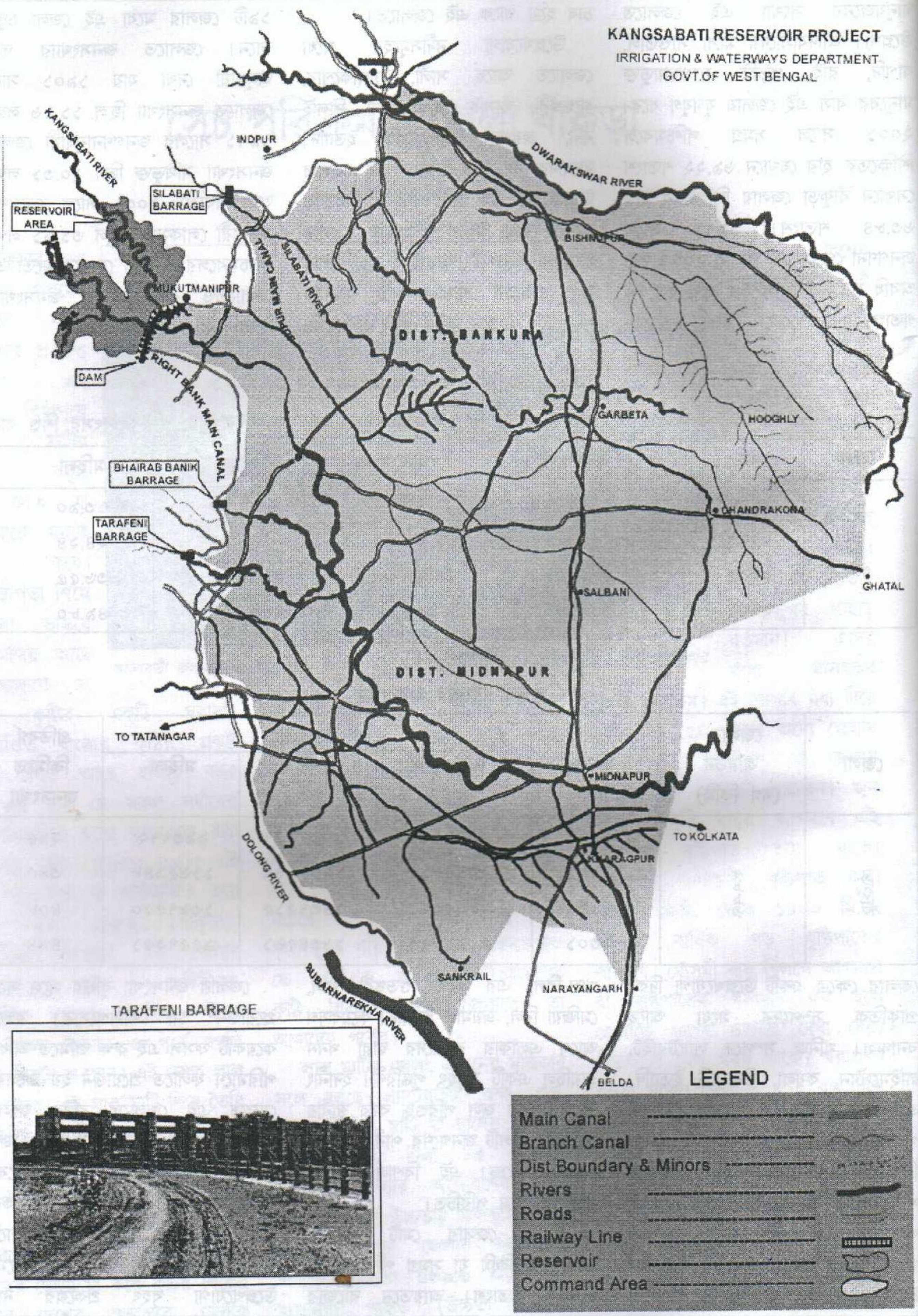

TARAFENI BARRAGE

সারণি—৩

কংসাবতী জলাধার প্রকল্পের কিছু তথ্য

০১. জলাধারের নির্মাণের স্থান—বাঁকুড়া জেলার খাতরা মহকুমার মুকুটমণিপুরে

০২. কোন নদীর উপর নির্মিত—কংসাবতী ও কুমারী নদীর সংযোগ স্থলের থেকে ৩.২ কিমি উজানে।

০৩. বাঁধের প্রকার—গ্র্যাভিটি টাইপ মাটির বাঁধ, ভার চাপানো কংক্রিটের স্কিলওয়ে সহ।

০৪. স্ট্রাকচারাল তথ্য :

(i) শুধু বাঁধের দৈর্ঘ্য—৬.৪৪ কিমি

(ii) গভীরতম ভিত থেকে বাঁধের উচ্চতা—৪১.১৫ মি. (নদীর তলের উপর থেকে)

(iii) বাঁধের উপরিভাগের চওড়া—১২.১৯ মিটার

(iv) কংসাবতী নদীর উপরের বাঁধের শীর্ষস্থানের উচ্চতা—১৩৮.০৭ মি. জি টি এস

(v) কুমারী নদীর উপরের বাঁধের শীর্ষস্থানের উচ্চতা—১৩৮.৬৮ মি. জি টি এস

(vi) স্কিলওয়ে-এর দৈর্ঘ্য—১২৪.৯৭ মি.

(vii) স্পিলওয়ের পথের সংখ্যা—১১টি

(viii) স্পিলওয়েতো প্রতিটি পথের চওড়া—৯.১৪ মি.

(ix) স্পিলওয়ের শীর্ষস্থানের উচ্চতা—১২৪.৩৫ মি. জি টি এস

(x) বাঁধের দৈর্ঘ্য ও ডাইকের দৈর্ঘ্য হিল লক্‌সহ—১১.২৭ কিমি

০৫. হাইড্রলিক তথ্য :

(i) সর্বোচ্চ জলাধারের (Pond) জলের গভীরতা—১৩৪.১৯ মি. জি টি এস

(ii) জলাধারের নক্সাকৃত জলের গভীরতা—১৩৫.৬৩ মি. জি টি এস

(iii) জলাধারের অব্যবহৃত জলের গভীরতা—১২০.৪০ মি. জি টি এস

(iv) নক্সাকৃত নির্গত জলের পরিমাণ (স্পিলওয়ে থেকে)—৫৬৬০ কিউসেক

(v) বাঁ পাশের হেড রেগুলেটর থেকে ক্যানেলে জল নির্গন ক্ষমতা—১৯২.৪৪ কিউসেক

(vi) ডান পাশের হেড রেগুলেটর থেকে ক্যানেলে জল নির্গন ক্ষমতা—৭৯.২৪ কিউসেক

০৬. হাইড্রলোজিক্যাল তথ্য :

(i) জলাধারের জলসত্রের ক্ষেত্রফলের আয়তন—৩৬২৬ বর্গকিমি

(ii) জলাধারের সমগ্র জলসিক্ত স্থানের ক্ষেত্রফলের আয়তন—১৩৬৬২ বর্গকিমি

(iii) সেচের কাজে সরবরাহ করার জন্যে সংরক্ষিত জল—৯০০৮২ হেক্টর মিটার

(iv) সর্বদা যে পরিমাণে জল জলাধারে সংরক্ষিত থাকে—১৩৫৭৪ হেক্টর মিটার

(v) বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত—১৩৭.০৬ সেন্টি মিটার

—২৪১৫ কিমি (সংযোগকারী খাল ও ক্ষুদ্র খাল)

০৭. অন্যান্য তথ্য :

(i) খালের (ক্যানেল) দৈর্ঘ্য—৮০৫ কিমি (জল খাল ও শাখা খাল)

(ii) ডাইকের দৈর্ঘ্য—৩.৬২ কিমি

(iii) সমগ্র সেচসেবিত এলাকা—৩৪০৮৯০ হেক্টর (খরিফ) ৬০৭২৯ হেক্টর (রবি)

(iv) মোট কমান্ডেড এলাকা—৬১৭৪০৯ হেক্টর

(v) বাঁধ ও ডাইকের মুক্ত উপরিভাগের দৈর্ঘ্য—৩.০৪৮ মিটার

সারণি—৪

কংসাবতী জলাধার প্রকল্প থেকে সেচের জল সরবরাহ ক্ষেত্রের আয়তন ও জলের গভীরতা (ফুট)

বৎসর	খরিফ			রবি			বোরো		
	সেচের জল সরবরাহ ক্ষেত্রের আয়তন (একর/হেক্টর)		গভীরতা পরিমাণ (ফুট)	সেচের জল সরবরাহ ক্ষেত্রের আয়তন (একর/হেক্টর)		গভীরতার পরিমাণ (ফুট)	সেচের জল সরবরাহ ক্ষেত্রের আয়তন (একর/হেক্টর)		গভীরতা পরিমাণ (ফুট)
	একর	হেক্টর	ফুট	একর	হেক্টর	ফুট	একর	হেক্টর	ফুট
১৯৭৭-৭৮	৫৫২,৬৭৮	২২৩,৭৫৫	১.৫৭	৫০,২৬৩	২০,৩৪৯	১.৫৬	—	—	—
১৯৭৮-৭৯	৫৯০,১১১	২৩৮,৯১১	১.২৭	৭১,৮৭৬	২৯,১০০	৩.৩৫	—	—	—
১৯৭৯-৮০	৪৮৭,৭৫৮	১৯৭,৪৭৩	০.৭৯	—	—	—	—	—	—
১৯৮০-৮১	৫৯৩,৬৩৫	২৪০,৩৩৪	১.২৭	৫২,৯২৮	২১,৪২৮	১.৯৩	—	—	—
১৯৮১-৮২	৬৩৬,৩৬২	২৫৭,৬৩২	১.৪৮	৪,০১৭	১,৬২৬	৪.৫৪	—	—	—
১৯৮২-৮৩	৪৫৬,৫৩৬	১৮৪,৮৩২	০.৮৬	৬,৭২৯	২,৭২৪	৩.২৩	—	—	—
১৯৮৩-৮৪	৫৪৬,৫৩৩	২২১,২৬৮	০.৬	৫১,৮৮৭	২১,০০৭	২.৭৯	—	—	—
১৯৮৪-৮৫	৬৪৬,৩২৪	২৬১,৬৭০	০.৮১	৪৪,৫৮৮	১৮,০৫২	২.৭৯	—	—	—
১৯৮৫-৮৬	৬৫০,৯২১	২৬৩,৫৩১	১.১৫	৫৭,২৭০	২৩,১৮৬	—	১৯,৩৬০	৭৮,৩৮	৫.০৪
১৯৮৬-৮৭	৬৩২,৫১৬	২৫৬,০৭৯	১.১৯	৫২,০৪৮	২১,০৭২	—	৪৬,৭৪৫	১৮,৯২৫	৩.৯৫
১৯৮৭-৮৮	৬৬১,৯৩৮	২৬৭,৯৯১	১.৭১	১৮,২৬৩	৭,৩৯৪	৬.০৪	—	—	—
১৯৮৮-৮৯	৬৭৫,৭১৮	২৭৩,৫৭০	১.৩৫	—	—	—	—	—	—
১৯৮৯-৯০	৬৭০,৮৯১	২৭১,৬১৬	১.০৮	৪৫,৩০৮	১৮,৩৪৩	—	৪৩,৭৩০	১৭,৭০৪	৩.৯৫
১৯৯০-৯১	৬৭৯,১০০	২৭৪,৯৩৯	১.০৭	৯১,৩৪৭	৩৬,৯৮৩	—	৬১,৭৫১	২৫,০০০	২.৯৯
১৯৯১-৯২	৬৬৫,৯০৬	২৬৯,৫৯৮	০.৮	১,০১,২৬৬	৪০,৯৯৮	১.৯৪	—	—	—
১৯৯২-৯৩	৬৬০,২৯৩	২৬৭,৩২৫	০.৯৮	১,০৭,০৬৫	৪৩,৩৪৬	৩.১২	—	—	—
১৯৯৩-৯৪	৬৪০,২৭৬	২৫৯,২২১	০.৫২	১,০০,৯৬৮	৪০,৮৭৮	—	৫১,৬৭৪	২০,৯২১	৩.১১
১৯৯৪-৯৫	৬৪৮,০৯৭	২৬২,৩৮৭	১.১৬	১,০২,৪৮০	৪১,৪৯০	—	৩,২১৬	১,৩০২	২.২১
১৯৯৫-৯৬	৬১৬,৫৬৮	২৪৯,৬২৩	১.০২	১,১১,৪৩৯	৪৫,১১৭	—	৬৫,৩০৬	২৬,৪৪০	৩.৩৫
১৯৯৬-৯৭	৬১৪,৬৯৮	২৪৮,৮৬৬	১.৪৫	—	—	—	—	—	—
১৯৯৭-৯৮	৬১২,২৯২	২৪৭,৮৯২	১.৬১	১,১০,৭১৯	৪৪,৮২৬	—	৪০,২৭৯	১৬,৩০৭	২.৩২
১৯৯৮-৯৯	৪১২,৮০১	১৬৭,১২৬	০.৯৩	৯৯,৩৫২	৪০,২২৩	—	৪৯,৬৩৪	২০,০৯৫	৩.৯৪
১৯৯৯-২০০০	৬২৬,১৬১	২৫৩,৫০৬	০.৮৩	১,১২,৬১৪	৪৫,৫৯৩	—	৬৯,০২২	২৭,৯৪৪	৩.৪৬
২০০০-২০০১	৪৮৭,৮০০	১৯৭,৪৯০	০.৯৯	—	—	—	—	—	—
২০০১-২০০২	৬১৮,৬৭৫	২৫০,৪৭৬	১.৩১	১,১৫,৮৭৪	৪৬,৯১৩	২.৬৭	—	—	—
২০০২-২০০৩	৬০২,৭৭৩	২৪৪,০৩৮	১.২৭	১,১৬,৬৮৯	৪৭,২৪৩	—	৫০,৪১৬	২০,৫৭৩	২.৭২
২০০৩-২০০৪	৫৬০,৩০৮	২২৬,৮৪৫	১.১	১,১৫,৬৪৩	৪৬,৮১৯	৩.১	—	—	—

কংসাবতী জলাধার প্রকল্প। স্বাধীন ভারতবর্ষে প্রকল্পটির কাজ শুরু হয় ১৯৫৬ সালে কংসাবতী ও কুমারী নদীর সংযোগ স্থলে মাটির বাঁধ তৈরি করে এই জলাধার নির্মিত হয়। ১৯৬৪ সালে কংসাবতী নদীর উপর বাঁধটি নির্মাণের কাজ সম্পন্ন হয় ও ১৯৭৩ সালে কুমারী নদীর উপর বাঁধটি নির্মাণের কাজ শেষ হয়। কিন্তু ১৯৬৫-৬৬ সাল থেকেই এই প্রকল্পের জল সরবরাহ করা হয় সেচের কাজে। জেলার ক্ষেত্রে তথা রাজ্যের ক্ষেত্রে কংসাবতী জলাধার প্রকল্প সার্থকভাবেই রূপায়িত হয়। জলাধারের মূল অংশ অর্থাৎ বাঁধ ও কংক্রিট স্ট্রাকচারের অংশ বাঁকুড়া জেলার খাতরা মহাকুমার মুকুটমণিপুরে। জলাধারের কিছু অংশ পুরুলিয়া জেলাতে অবস্থিত। অর্থাৎ এই প্রকল্প দুই জেলার সীমা রেখায় অবস্থিত, (সারণি-৩)। এই জলাধার থেকে শুধুমাত্র বাঁকুড়া জেলার জন্যই সেচের জল সরবরাহ করা হয় না, সঙ্গে মেদিনীপুর ও হুগলির বেশ কিছু অংশতেও এই সেচের জল ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ১৯৬৫-৬৬ সাল থেকে সেচসেবিত এলাকা বৃদ্ধি হয় এই জলাধার প্রকল্পর (সারণি-৪)। এই জলাধারের জল সঠিকভাবে সময়মতো সেচসেবিত এলাকায় সরবরাহ করার জন্য নির্মাণ করা হয় তিনটি ব্যারেজ। তিনটি ব্যারেজ নির্মিত হয় যথাক্রমে শিলাবতী নদী, ভৈরববাকী নদী ও তারাফেনী নদীর উপর এবং ওই নদীগুলির নাম অনুসারে এই ব্যারেজগুলির নাম করা হয় যথাক্রমে শিলাবতী ব্যারেজ, ভৈরববাকী ব্যারেজ ও তারাফেনী ব্যরেজ (সারণি-৫)। কংসাবতী বৃহৎ জলাধার প্রকল্প ছাড়াও জেলার বিভিন্ন প্রান্তে সেচের জল

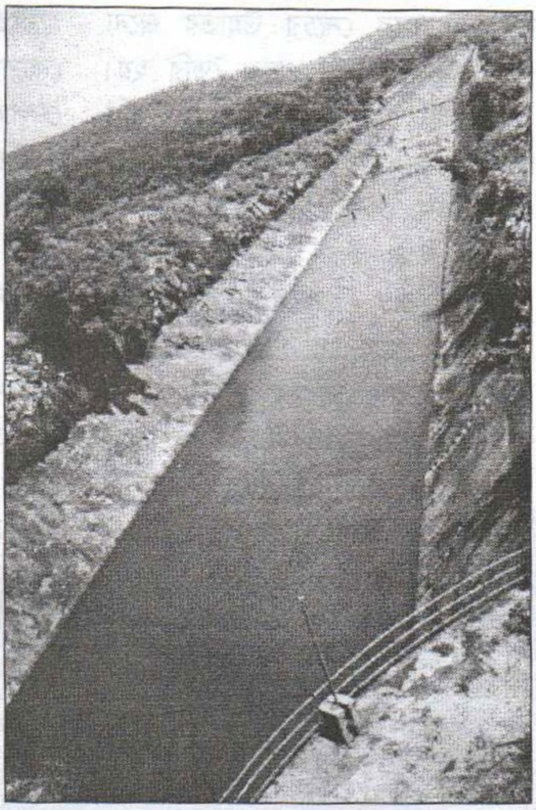

কংসাবতী জলাধারের মুখ্য ক্যানেল

সারণি—৫

কংসাবতী প্রকল্পের জল সমস্ত সেচসেবিত এলাকাতে সঠিকভাবে বন্টন ও সরবরাহ করার জন্যে তিনটি ব্যারেজ তৈরি করা হয়। ব্যারেজগুলি শিলাবতী, ভৈরববাকী ও তারাফেনী। এই ব্যারেজগুলির সম্পর্কে তথ্য নিম্ন সারণিতে দেওয়া হল।

ক্রমিক সংখ্যা	বিষয়	শিলাবতী ব্যারেজ	ভৈরববাকী ব্যারেজ	তারাফেনী ব্যরেজ
১.	ব্যারেজ-এর স্থান জেলা-বাঁকুড়া	কদমদেউলি, থানা-ইন্দপুর, জেলা-বাঁকুড়া	জটোডুমুর, থানা-দুধিয়া,	বৈষ্ণবপুর, থানা-ছোট সুখঝোড়া, বাঁকুড়া
২.	ব্যরেজের অবস্থান যে নদীতে	শিলাবতী নদী	ভৈরববাকী নদী	তারাফেনী নদী
৩.	জলসত্রের আয়তন	১৮১.৩০ বর্গ কিমি	১৯১.৬৬ বর্গ কিমি	১৮৬.৪৮ বর্গ কিমি
৪.	স্পিলওয়ের (spillway)-এর পথের সংখ্যা	৮টি	৬টি	১০টি
৫.	প্রতিটি স্পিলওয়ের চওড়া	৯.১৪ মিটার	৯.১৪ মিটার	৬.০৯ মিটার
৬.	হেড রেগুলেটর (Hed Regulator)-এর সংখ্যা	১টি	১টি (ডানতীরে)	১টি (ডানতীরে)
৭.	হেড রেগুলেটর-এর উচ্চতা	৩.০৫ মিটার	১.৫২ মিটার	১.৫২ মিটার
৮.	নক্সাকৃত ব্যারেজের জল নির্গতের পরিমাণ	১২১০ কিউসেক	৮০৬.৫৫ কিউসেক	—
৯.	নক্সাকৃত ক্যানেলের জল নির্গতের পরিমাণ	১১০.৫১ কিউসেক	৬৭.৯২ কিউসেক	৬২.২৬ কিউসেক
১০.	ক্যানেলের দৈর্ঘ্য	৯.৬৬ কিমি	—	—

সরবরাহ করে সেচের উন্নতির জন্যে পাঁচটি মাঝারি সেচ প্রকল্প তৈরি হয়। প্রকল্পগুলি সালি জলাধার প্রকল্প, সালি ভিন্নমুখী জলাধার প্রকল্প, মালিয়াঝোড় সেচ প্রকল্প, বেরাই খাল সেচ প্রকল্প ও শুভঙ্কর দাঁড়া সেচ প্রকল্প। এই সকল মাঝারি সেচ প্রকল্পের সেচসেবিত এলাকাতে জল সরবরাহ করে এই জেলার খরিফ, রবিসহ বোরো চাষও করা হয়ে থাকে (সারণি-৬)। কংসাবতী জলাধার থেকে বিভিন্ন জেলার সেচসেবিত এলাকাতে সরবরাহ করার পরিমাণের (১৯৯৩-৯৪) একটি (সারণি-৭) তথ্য থেকে বোঝা যায় যে হয়েছে। জেলাতে খরিফ, রবি চাষ সহ বোরো চাষও হয়ে থাকে। সাধারণত জেলাতে ধান আখ আলু বজরা, তিল সহ রবিশষ্য ও অন্যান্য চাষবাস হয়ে থাকে। এই বৃহৎ প্রকল্পের জন্য জেলাতে বৃদ্ধি পেয়েছে কৃষি ফলন।

কংসাবতী জলাধারের আশপাশে গড়ে উঠতে শুরু করেছে পর্যটন কেন্দ্র। সঠিকভাবে পর্যটন কেন্দ্রের রূপায়ণ না হলেও এই জলাধারের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, আশপাশের ছোট ছোট পাহাড়সহ এই অঞ্চলের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অপূর্ব। পরিকাঠামো গঠনের মধ্য দিয়ে এই এলাকাতে পর্যটন কেন্দ্রের যুক্ত। এছাড়াও সিল্কতাঁত, লাক্ষাশিল্প, কয়লার খনি, কাপড়-জামার শিল্পসহ অন্যান্য জীবিকার সঙ্গেও অনেক মানুষ যুক্ত। মুকুটমণিপুরসহ অন্যান্য ও অনেক মানুষ পাঁচটি মাঝারি জলাধারের স্থানে গড়ে তোলা যেতে পারে পর্যটন শিল্প। জলাধারগুলি ব্যবহার করে করা যেতে পারে মৎস্য চাষ। বনসৃজন করে জলাধারগুলির আশপাশের মানুষের আর্থিক সচ্ছলতা বৃদ্ধি ঘটানো যেতে পারে। এসব রূপায়ণের জন্যে জেলার বৃহৎ ও মাঝারি জলাধারগুলি যে বিশেষ ভূমিকা পালন করবে তা নিশ্চিত বলা যায়।

সারণি—৬

বাঁকুড়া জেলার মাঝারি সেচ প্রকল্প (২০০৪-২০০৫)

ক্রমিক সংখ্যা	সেচ প্রকল্পের নাম	জেলা	অন্তিম সেচ ক্ষমতা '০০০ হেক্টর	সেচসেবিত এলাকা '০০০ হেক্টর
১	সালি জলাধার প্রকল্প	বাঁকুড়া	০.৫৯	০.৬৭
২	সালি ভিন্নমুখী জলাধার প্রকল্প	বাঁকুড়া	২.২৭	১.০৪৬
৩	মালিয়াঝোড় সেচ প্রকল্প	বাঁকুড়া	১.২৫৫	১.৯৮৪
৪	বেরাই খাল সেচ প্রকল্প	বাঁকুড়া	৩.৬৩	২.৮৯৯
৫	শুভঙ্কর দাঁড়া সেচ প্রকল্প	বাঁকুড়া	২.৪৩	১.৫৩৯

সারণি—৭

কংসাবতী জলাধারের সেচসেবিত এলাকার পরিমাণ (হেক্টর) জেলাভিত্তিক

জেলা	১৯৯৩-৯৪			
	খারিফ	রবি	বোরো	মোট
বাঁকুড়া	১,২০,১৯০	২২,৭৭৭	১৯,৮০২	১,৬২,৭৬৯
মেদিনীপুর	১,২২,৮২৬	১৪,৩৩৬	১,১১৮	১,৩৮,২৮০
হুগলি	১৬,২০৪	৩,৭৬৪	—	১৯,৯৬৮
মোট	২,৫৯,২২০	৪০,৮৭৭	২০,৯২০	৩,২১,০১৭

এক বিপুল পরিমাণের এলাকার চাষের জন্যে সেচের জল ব্যবহার করা হয়। এই বৃহৎ ও মাঝারি প্রকল্পের সেচের জলের জন্যে জেলাতে চাষবাসের উন্নতি প্রসার ঘটলে গড়ে উঠবে অন্যান্য শিল্প, যার ফলে জেলার মানুষের কর্মসংস্থান হতে পারে। সাধারণত জেলার অধিকাংশ মানুষ কৃষি-জীবিকার সঙ্গে

কংসাবতী জলাধারের জল সঠিকভাবে সংরক্ষণ ও অপচয় রোধ করে সেচসেবিত এলাকাতে বেশি করে জল সরবরাহ লক্ষে এই জলাধারের আধুনিকীকরণের পরিকল্পনা চলছে। আধুনিকীকরণের পরিকল্পনা থাকলেও স্থানীয় চাষিদের জলের অপচয় রোধে ভূমিকা গ্রহণ করার উদ্যোগ রাখা প্রয়োজন। এই সকল কর্ম সম্পাদন হলে বাঁকুড়া জেলা সবুজায়নে আরও একধাপ অগ্রসর হবে।

তথ্যসূত্র :

(1) Census of India—1981, 1991 & 2001.
(2) West Bengal District Gazetteres.
(3) Reports of I & W. date.

লেখক : অবর-সহ বাস্তুকার, সেচ ও জলপথ দপ্তর

ইছামতী ফিরছে আবার ইছামতীতেই

শচীন দাশ

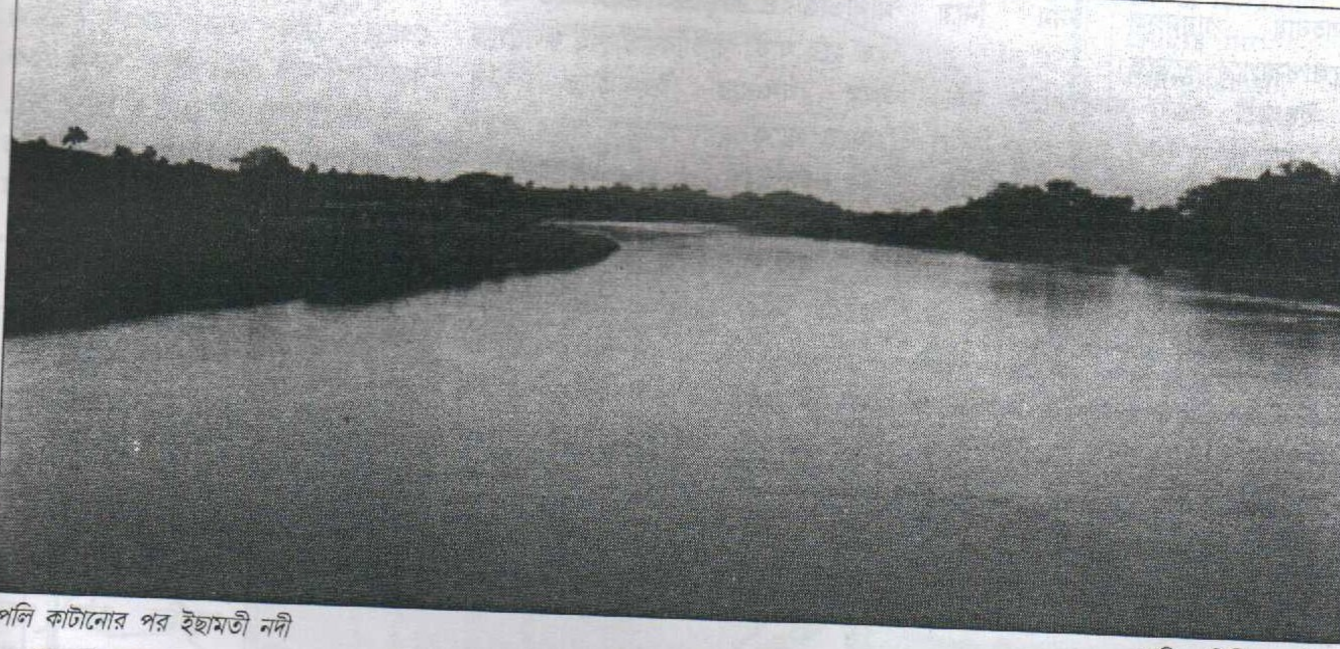

পলি কাটানোর পর ইছামতী নদী

ছবি : দিলীপ কর্মকার

বিভূতিভূষণ তাঁর 'ইছামতী' উপন্যাসে ইছামতী নদীকে দেখেছিলেন এভাবে : '.... কত লোকের চিতার ছাই ইছামতীর জল ধুয়ে নিয়ে গেল সাগরের দিকে, জোয়ারে যায় আবার ভাঁটায় উজিয়ে আসে, এমনি বারবার করতে করতে মিশে গেল দূর সাগরের নীল জলের বুকে।' ইছামতীর জলধারা তখন ...চঞ্চল বেগে বয়ে চলেছে বড় লোনাগাঙের দিকে, সেখান থেকে মোহনা পেরিয়ে, গঙ্গা-সাগর পেরিয়ে মহাসমুদ্রের দিকে।'

অথচ একদা চঞ্চল, মহাসমুদ্রের দিকে াবমান, বিভূতিভূষণের সেই 'ছোটনদী' ছামতীই একুশ শতকের দোরগোড়ায় সে আবার অন্যরকম। নদীগর্ভে যত্রতত্র ন কচুরিপাড়ায় ঢাকা। ভেচাল, কমোট, টা ইত্যাদিতে নদীপথ অবরুদ্ধ। তার পর ফি-বছর বন্যার আশঙ্কায় হাজার জার মানুষ দিশাহারা। বন্যায় নদিয়ার কিছু অংশ থেকে উত্তর চব্বিশ পরগনার বনগাঁ, বসিরহাট ও বারাসাত মহকুমার আটটি ব্লক ও তিনটি পুরসভার লক্ষ লক্ষ মানুষকে করে তুলেছে বানভাসি। ক্ষতি হচ্ছে হাজার হাজার বিঘের ফসল। হাজার হাজার মানুষ হচ্ছে ঘরছাড়া। কিন্তু কেন! কেনই বা ওই অবরুদ্ধ প্রবাহ তার দুই পাড়ের বিস্তীর্ণ জনজীবনে এমন আতঙ্ক নিয়ে আসছে ?

কথায় আছে, নদীপাড়ে বাস ভাবনা বারোমাস। তা এমন ভাবনা কিছু অমূলক নয়। নদী কখন যে কী বিচিত্র খেয়ালে, কীভাবে যে পাড়বাসী মানুষ ও মানুষেরই তৈরি বৈভবকে ভাসিয়ে নিয়ে যায় তা নিজেও জানে না মানুষ। অথচ তবুও কী বিস্ময়ের, সেই মানুষেরই আশ্রয় কিন্তু আবার নদী। নদী পাড়েই তার ব্যবসা-বাণিজ্য, কৃষ্টি-সংস্কৃতি ও সভ্যতার ইমারত। নদী মানুষের প্রাণ। নদী মানবের জীবন। তবু এই জীবনেই নদী আবার মাঝে মাঝে তার দুঃখের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এবং মানব জীবনে যদি সে-কারণের কোনো অনুসন্ধান না থাকে, তাহলে একদা চঞ্চল ধারার বেগবান নদীও যে তার দুঃখের কারণ হয়ে উঠবে তাতে আর সন্দেহ কী ! যেমন এই শতকেরই গোড়ায় প্রশ্ন উঠেছে ইছামতীকে নিয়ে।

ইছামতীর জন্ম বাংলাদেশের পদ্মারই শাখানদী মাথাভাঙা থেকে। পূর্বদিক থেকে প্রবাহিত হয়ে এই নদী পশ্চিমবঙ্গের নদিয়া জেলার হাঁসখালি ব্লকের মাজদিয়া রেল স্টেশনের পশ্চিমে ১৮৮নং রেল সেতুর তলা দিয়ে তার প্রবাহকে নিয়ে বাংলাদেশের কুষ্টিয়াতে গিয়ে ঢুকেছে। পরে ওই কুষ্টিয়া থেকেই আবার নদিয়া জেলার হাঁসখালি ব্লকের মধ্য দিয়ে দত্তফুলিয়ার কাছাকাছি থেকে উত্তর চব্বিশ পরগনার বাগদা ব্লকের সিন্দ্রাণী গ্রাম পঞ্চায়েতের সাড়াহাটি

গ্রামে প্রবেশ করেছে। এরপর বাগদা, বনগাঁ, গাইঘাটা, স্বরূপনগর, বাদুড়িয়া বসিরহাট, টাকি, হাসনাবাদ ও হিঙ্গলগঞ্জ ব্লকের মাঝামাঝি হয়ে সুন্দরবনে গিয়ে মিশেছে। হিঙ্গলগঞ্জের বাজার পর্যন্ত এই নদী ইছামতী। এরপর সে কালিন্দী ও পরবর্তী পর্যায়ের প্রবাহটি গোসাবার কাছে হেড়োভাঙা ও মোহনায় রায়মঙ্গল নাম নিয়ে বঙ্গোপসাগরে পড়েছে।

ইছামতী একটি আন্তর্জাতিক নদী। তার যাত্রাপথের দৈর্ঘ্য প্রায় ৩৭০ কিমি। এর ভেতরে ১০০ কিমি ভারত-বাংলাদেশ সীমানার মধ্যে বহমান। ফলে এই দুই দেশের ওপর দায়িত্বও থাকে উক্ত নদীর রক্ষণাবেক্ষণে। এই রক্ষণাবেক্ষণের মধ্যে আসে নদীর সংস্কার, তার নাব্যতা রক্ষা ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা। কিন্তু এগুলির মধ্যেই দেখা দিয়েছে কিছু জটিলতা। কিছু প্রতিবন্ধকতা ! কিন্তু সেসব বিষয়ে ঢোকার আগে একবার দেখে নেওয়া দরকার, ইছামতী তার নাব্যতা হারাল কেন ?

যন্ত্রের দ্বারা পলি উত্তলন-ইছামতী নদীতে।

তথ্য বলছে, এমনও এক সময় গেছে যখন চূর্ণী ও যমুনা, ভাগীরতীর এই দুই প্রধান শাখানদী বছরভর ইছামতীকে জলের যোগান দিয়ে যেত। কিন্তু পরবর্তীকালে ভাগীরথীর নিজের জল কমে যাওয়াতে ইছামতীর জলের যোগানে ঘাটতি দেখা দেয়, একমাত্র ওই বর্ষায় বন্যার প্রকোপে বাড়তি জল এসে ঢুকে পড়া ছাড়া। এ ছাড়া ফরাক্কায় গঙ্গার ওপর ব্রিজ হবার ফলে ভৈরব ও মাথাভাঙারও কিছু জল ইছামতীতে আসা বন্ধ হয়ে যায়। স্বাভাবিকভাবেই জলস্রোত কমে যাওয়ায় ইছামতীতে পলি জমতে থাকে এবং হারিয়ে যেতে থাকে তার নাব্যতা।

এ তো গেল একদিক, অন্যদিকে এরই পাশাপাশি দেখা গেল আবার গত শতকের চল্লিশ দশকের ছোটো-বড় দুটি অভিঘাত। এক, ১৯৪২ সালে রাণাঘাট-গেদে রেললাইনে মাজদিয়া স্টেশনের কাছে ১৮৮নং রেলসেতু নির্মাণ ও প্রায় দুশো মিটার এলাকাব্যাপী নদীতীরে পাথরের বোল্ডার ফেলা এবং দুই, ১৯৪৭-এর দেশভাগের ফলে পূর্ব-পাকিস্তান ছেড়ে লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তু মানুষের এই নদীকে ঘিরে নতুন বসতি স্থাপন। শেষোক্ত এই অভিঘাতটি ভয়াবহ। এ উপমহাদেশের ইতিহাসের এক কলঙ্কিত অধ্যায়। যে অধ্যায়ের কলঙ্ক মোচনের চেষ্টায় খানিকটা হলেও বুঝি দায়ভার নিল ইছামতী।

দেশভাগের ফলে যে কয়েক কোটি উদ্বাস্তু এপারে চলে আসে তাদেরই এক বিরাট অংশ ইছামতী সংলগ্ন বাগদা, বনগাঁ, গাইঘাটা, হাবড়া, স্বরূপনগর, বাদুড়িয়া, গোবরডাঙা, বসিরহাট, টাকি, হাসনাবাদ ইত্যাদি অঞ্চলে বসতি গড়ে তোলে। গড়ে ওঠে অসংখ্য উদ্বাস্তু কলোনি। আর ওই তখন থেকেই শুরু হয় নদী দখল। নদীর চর ঘিরে চাষ, চাষের পাশাপাশি তৈরি হয় মাছের ভেড়ি ও ইটভাটা। নদীর বুকে বাঁধ দিয়ে জলের গতি আটকে মাছ ধরার জন্য পাটা, কমোট ও ঘুনির ব্যবস্থা হতে থাকে। কোথাও বা নদীর জলেই পাট পচানো হয়। এর ওপর রেল ও সড়ক পথে যোগা-যোগের জন্য এই নদীর ওপর অবৈজ্ঞানিকভাবে ঘন ঘন পিলার গেঁথে ব্রিজ তৈরি করা হয়। এতে নদীর পরিধি আরও সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে। এবং মৃত্যুযন্ত্রণা শুরু হয় ইছামতীর। পাশাপাশি বন্যারও কারণ হয়ে ওঠে সে।

নদীবহুল জনজীবনে বন্যা একটি স্বাভাবিক ঘটনা। ইছামতী উপন্যাসের সূচনাই পাই, '১২৭০ সালের বন্যার জল সরে গিয়েছে সবে। পথে ঘাটে তখনও কাদা, মাঠে মাঠে জল জমে আছে। অর্থাৎ বন্যা তখনও হত এবং এখনও হয়। কিন্তু নদীতীর খোলামেলা থাকায় বন্যা কিংবা জোয়ারের জল নদীতীরে ঘুরতফিরত আবার সময়মতো নেমেও যেত। ফলে ক্ষয়ক্ষতির তেমন নজির ছিল না। কিন্তু পরবর্তীকালে নদী অবরুদ্ধ হয়ে পড়ায় ও বিস্তীর্ণ পাড়ে ঘন

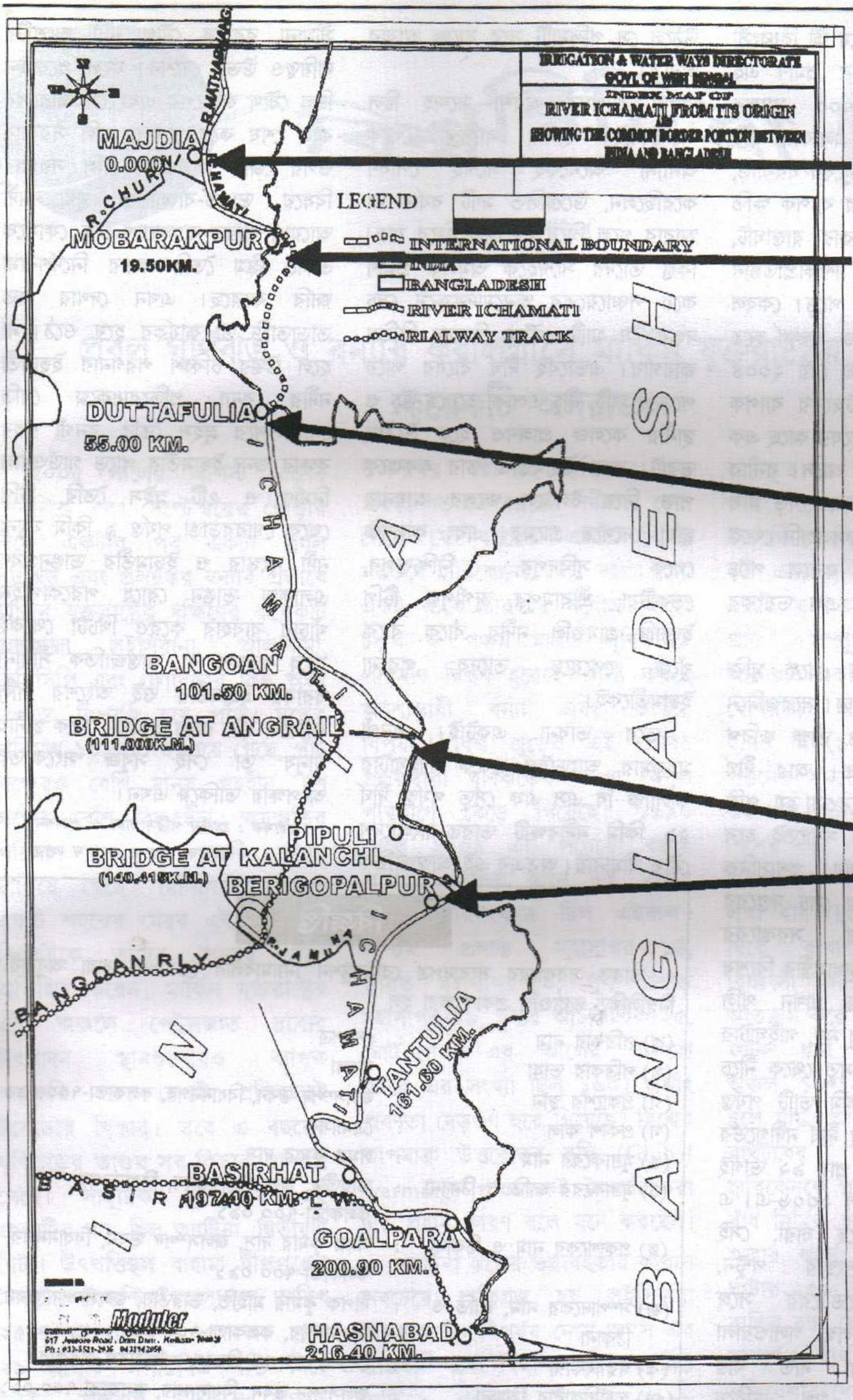

Majdia : Offtake of river Ichamati

Mobarakpur : River Ichamati enters into Bangladesh.

Duttafulia : River Echamati re-enters into India.

Bridge at Angrail to Bridge at Kalanchi.—common border portion Length : 29Km.

বসতি গড়ে ওঠায় বন্যা যে কী বিধ্বংসী ভূমিকা নিতে পারে তার প্রমাণ এই শতাব্দীরই গোড়ায় ২০০০ সালের ভয়াবহ বন্যা। সংশ্লিষ্ট এলাকার ৮টি ব্লকে প্রায় পঁচিশ লক্ষ মানুষের ঘরবাড়ি, ফসল ও গৃহপালিত পশুর ব্যাপক ক্ষতি হয়। এবং ওইসব এলাকার রাস্তাঘাট, অফিস-কাছারি ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ইত্যাদিও ক্ষতির কবলে পড়ে। কেবল তাই নয়, পুনর্গঠনের কাজ সম্পূর্ণ হতে না হতেই ফের বন্যা দেখা দেয় ২০০৪ সালে। এ বছরেই সেপ্টেম্বরের ব্যাপক বৃষ্টিপাত এ অঞ্চলের মানুষের কাছে এক ভয়াবহ অভিজ্ঞতা নিয়ে আসে। বন্যার জল সরতে সরতে প্রায় এক-দেড় মাস সময় নিয়ে নেয়। ফলে ফসলহানি থেকে স্বাস্থ্যহানি এই দুইয়ের কবলে পড়ে জনজীবনে নেমে আসে এক ভয়ংকর অভিশাপ।

আর এই অভিশাপ থেকে মুক্তি পেতেই শুরু হয় অনুসন্ধান। সরেজমিনে পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যবেক্ষণ ও তীক্ষ্ণ জরিপ চালানো হয় ইছামতীতে। আর দীর্ঘ জরিপের পরেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, পলি সরাতে হবে ইছামতীর। সরাতেই হবে ভেচাল, কমোট ও পাটা। প্রশাসনিক প্রচেষ্টা, রাজ্য সরকারের সেচ দপ্তরের কর্মতৎপরতা, কেন্দ্রীয় সরকারের সহযোগিতা ও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর বিশেষ উদ্যোগেই শুরু হয়েছে এখন পলি সরানোর কাজ। শুরু শুধু নয়, গাইঘাটার কালাঞ্চি বি এস এফ সেতু থেকে নীচে তেঁতুলিয়া সেতুর ২ কিমি ভাটি পর্যন্ত মোট ২৪.৯ কিলোমিটার দীর্ঘ নদীগর্ভের পলি সরানোর কাজের প্রায় ৯২ ভাগই শেষ হয়েছে গত এপ্রিল ২০০৬-এ। এ কাজের বরাদ্দ পেয়েছে যারা, সেই ম্যাকিনটস বার্ন সংস্থার পন্টুন, এক্সকেভেটর, এক্সকেভেটরের সঙ্গে যুক্ত জিরাফের মতো লম্বা গলাওয়ালা 'বুম' তার ধারালো দাঁত বার করে নদীর জলে মুখ ডুবিয়ে ডুবিয়ে কামড়ে কামড়ে তুলে আনছে পলি। তারপর উত্তোলিত সে পলি চলে যাচ্ছে পাড়ে। এরপর শুকিয়ে উঠলে সে পলিমাটি সরে যাচ্ছে আবার অন্যত্র।

এ ব্যাপারে অবশ্য সন্দেহ ছিল অনেকেরই। স্থানীয় বাসিন্দা থেকে অন্যান্য অনেকেই সন্দেহ পোষণ করেছিলেন, উত্তোলিত মাটি বর্ষায় না আবার গলে গিয়ে নদীগর্ভে ফিরে যায়। কিন্তু তাদের সন্দেহকে অমূলক প্রমাণ করে পঞ্চায়েতের অনুমোদনক্রমে সেচ দপ্তর সে মাটি পৌঁছে দিয়েছে বিভিন্ন জায়গায়। এভাবেই দীর্ঘ বাঁধের গায়ে পড়েছে মাটি, নীচু এলাকা হয়েছে উঁচু ও স্থানীয় কলেজ প্রাঙ্গণও হয়ে উঠেছে ভরাট। আর ইছামতীও তার ঝকঝকে পাড় নিয়ে টলটলে জলের আয়নায় ছায়া দেখেছে গ্রামের। এবং কালাঞ্চি থেকে সুবিদপুর, নিশ্চিন্তপুর, ভেকটিয়া, শ্রীরামপুর, দুর্গাপুর, টিপি ইত্যাদি গ্রামগুলি নদীর বাঁকে বাঁকে খুঁজে পেয়েছে তাদের পুরনো ইছামতীকেই।

তবে ভাবনা একটাই। বনগাঁ মহকুমার আংড়াইল থেকে গাইঘাটার কালাঞ্চি বি এস এফ সেতু পর্যন্ত দীর্ঘ ২৯ কিমি নদীবক্ষটি ভারত-বাংলাদেশ যৌথ সীমানায়। অতএব এই আন্তর্জাতিক সীমানা বরাবর যৌথ নদী অংশটির দায়িত্বও উভয় দেশের। ফলে প্রয়োজন ছিল যৌথ জরিপের এবং সে জরিপের কাজ শেষ করে তারাও পলি সরাবার ওপর জোর দিয়েছেন। পলি সরাবার বিষয়ে ভারত-বাংলাদেশ যুগ্ম নদী আয়োগ ভারত-বাংলাদেশ টাস্ক ফোর্সকে একটি স্কিম তৈরি করার নির্দেশনামা জারি করেছে। এখন দেখার কত তাড়াতাড়ি তা কার্যকর হয়ে ওঠে। না হলে উত্তর চব্বিশ পরগনার ইছামতী নদীর বন্যা প্রতিরোধকল্পে বেড়ি গোপালপুরে স্লুইস তৈরি, বনগাঁ শহর রক্ষার জন্য ইছামতীর পাড়ে গার্ডওয়াল নির্মাণ ও ৫টি স্লুইস তৈরি, টিপি থেকে গোবরডাঙা পর্যন্ত ৯ কিমি যমুনা নদী সংস্কার ও ইছামতীর ভাঙনপ্রবণ এলাকায় ভাঙন রোধে পরকোপাইন খাঁচার ব্যবহার করেও খিঁচটা থেকেই যাবে যতক্ষণ না আন্তর্জাতিক সীমানা বরাবর ইছামতীর ওই অংশের পলি কাটানো হয়। রাজ্য প্রশাসন থেকে স্থানীয় মানুষ তা সেই সবুজ সংকেতের অপেক্ষায় তাকিয়ে এখন।

লেখক : প্রাক্তন পরিসংখ্যান ও প্রকাশন সহায়ক, সেচ ও জলপথ দপ্তর

বিজ্ঞপ্তি

ভারত সরকারের সংবাদপত্র রেজিস্ট্রেশন নিয়মাবলীর (১৯৫৬) ধারা অনুযায়ী নিম্নলিখিত তথ্যগুলি প্রকাশ করা হল :

(ক) পত্রিকার নাম	:	সেচপত্র
(খ) পত্রিকার ভাষা	:	বাংলা
(গ) প্রকাশের স্থান	:	জলসম্পদ ভবন, বিধাননগর, কলকাতা-৭০০ ০৯১
(ঘ) প্রকাশ কাল	:	ত্রৈমাসিক
(ঙ) মুদ্রাকরের নাম	:	সমর কুমার দাস
(চ) মুদ্রাকরের জাতি ও ঠিকানা	:	ভারতীয়, জলসম্পদ ভবন, বিধাননগর, কলকাতা-৭০০ ০৯১
(ছ) প্রকাশকের নাম ও ঠিকানা	:	সমর কুমার দাস, জলসম্পদ ভবন, বিধাননগর, কলকাতা-৭০০ ০৯১
(জ) সম্পাদকের নাম, জাতি ও ঠিকানা	:	দীপক কুমার মাইতি, ভারতীয়, জলসম্পদ ভবন, বিধাননগর, কলকাতা-৭০০ ৯১
(ঝ) স্বত্বাধিকারী	:	সেচ ও জলপথ বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার
(ঞ) স্বত্বাধিকারীর ঠিকানা	:	জলসম্পদ ভবন, বিধাননগর, কলকাতা-৭০০ ০৯১

আমি, সমর কুমার দাস এতদ্বারা ঘোষণা করছি যে, উপরোক্ত তথ্যগুলি আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য।

স্বাক্ষর : **সমর কুমার দাস**

বিশ্ববিচিত্রা

অঞ্জন দাশগুপ্ত

প্রবল ঘূর্ণিঝড় ও বন্যার করালগ্রাসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণের কয়েকটি অঙ্গরাজ্য

২০০৫ সালের আগস্ট মাসের শষদিকে এবং সেপ্টেম্বরের গোড়ার দিকে একটার পর একটা প্রবল ূর্ণিঝড় এবং প্রলয়ঙ্কর বন্যার প্রভাবে ার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণের কয়েকটি অঙ্গরাজ্য লুইসিরানা, আলাবামা, মিসিসিপি এবং ফ্লোরিডার কিছু অংশ বিধ্বস্ত, বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। মৃতের রিমাণ ১০,০০০ ছাপিয়ে গেছে, পাঁচ ক্ষেরও বেশি মানুষ গৃহহীন, দশ ক্ষের বেশি বিদ্যুৎহীন, ক্ষয়ক্ষতির রিমাণ ১০,০০০ কোটি ডলার াপিয়ে গেছে। মিসিসিপি রাজ্যের কটি শহরের মেয়র এই প্রাকৃতিক পর্যয়কে তাদের 'সুনামি' বলে ভিহিত করেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ই অঞ্চলে পেট্রোলজাত দ্রব্যের ৎপাদন স্থানগুলোরও ব্যাপক য়ক্ষতি হয়। দেশটি প্রতিবছরই র্নেডোর শিকার। তবে এ বছরের র্ণিঝড়ের তাণ্ডব সব কিছুকে ছাপিয়ে ছে। সামুদ্রিক ঘূর্ণিঝড়ের এই থমটির নাম ছিল ক্যাট্রিনা, দ্বিতীয়টি টা। উৎপত্তিস্থল বাহামা দ্বীপপুঞ্জের কটে আটলান্টিক মহাসাগরে, তারিখ ২শে আগসঔ, ২০০৫। এর পরে ৩ আগস্ট অপরিমিত শক্তি নিয়ে র্কিন যুক্তরাষ্ট্র উপকূলে আঘাত েন। ঝড়ের গতিবেগ ছিল ঘণ্টায় ০০ কিমি এবং ৫.৮ মি (১৯ ফুট) ত্তি জলোচ্ছ্বাস হয়। কারিবিয়ান উপসাগর বরাবরই হারিকেন ঝড় প্রবণ। গত ৩৫ বছরের সমীক্ষায় দেখা গেছে যে বছরের একটি নির্দিষ্ট মরশুমে হারিকেনের মোট সংখ্যা প্রায় একই, তবে তীব্রতায় সর্বোচ্চ অর্থাৎ চতুর্থ ও পঞ্চম মাত্রার ঘূর্ণিঝড়ের পরিমাণ দ্বিগুণ হয়েছে। সৃষ্টি করছে অবশ্যম্ভাবী বন্যা এবং জাতীয় বিপর্যয়। বিশ্ব জুড়েও এই শ্রেণির প্রলয়ঙ্কারী ঘূর্ণিঝড়ের সংখ্যা বিপুল পরিমাণে বেড়ে গিয়েছে। ১৯৯০ থেকে ২০০৪ এই পনেরো বছরে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে এই মাত্রার ঝড়ের পরিসংখ্যান ছিল এইরূপ : পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগর-১১৬, ভারত মহাসাগর-৫০, পূর্ব প্রশান্ত মহাসাগর-৪৯, উত্তর আটলান্টিক-২৫, মোট-২৪০, এর আগের পনেরো বছরে এর সংখ্যা ছিল ১৬০। অর্থাৎ প্রবণতা দেড়গুণ হয়ে গিয়েছে। বিশ্বের তাপমাত্রা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি (Global warming) পাওয়াকেই বৈজ্ঞানিকেরা এর প্রধান কারণ বলে মনে করছেন।

ক্যাট্রিনা ঝড়ের ভয়াবহতার কারণে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয় লুইসিনিয়া অঙ্গরাজ্যটি। বিপর্যয় নেমে আসে এর রাজধানী এবং বিখ্যাত নদীবন্দর নিউ অর্লিন্স শহরের। শহরটি ১৭১৮ সালে ফরাসী ঔপনিবেশিকরা প্রতিষ্ঠা করেন এবং ১৮০৩ সালে বিক্রয়ের মাধ্যমে এই রাজ্যটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গীভূত হয়। মার্কিন জ্যাজ সংগীতের জন্য সুবিখ্যাত এই শহরটিকে উত্তরদিকে ঘিরে রয়েছে মিসিসিপি নদী এবং দক্ষিণ পল্টচারট্রেন নামে একটি বৃহদাকার হ্রদ। শহরটি তাই প্রায় সম্পূর্ণভাবে জলবেষ্টিত। আকারটি একটি গামলার মতো এবং বেশিরভাগ অঞ্চলই সমুদ্রতল থেকে ২.৭৭ মি (৯ ফুট) তলায়। শহরটি পত্তনের সময়ে উঁচু জমিতে বসবাস শুরু হয়। এখনও ব্যস্ত অঞ্চলগুলো বিশেষ করে ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানসমূহ অপেক্ষাকৃত উঁচু জমিতে। ৫৩০ কিমি লম্বা বাঁধ (Levee) দিয়ে শহরটিকে ঘিরে রাখা হয়েছিল। এবারের বিধ্বংসী বন্যার জল ছাপিয়ে বাঁধ অতিক্রম করে এবং অনেক স্থানে বাঁধে ফাটল ধরে শহরটির প্রায় ৮০% অঞ্চল ১০-১২ ফুট জলের তলায় চলে যায়। আকৃতিটি নেয় একটি বড় বাথটবের মতো। ৩ মাত্রার হারিকেনকে প্রতিরোধ করার জন্য এই বাঁধ নির্মিত হয়েছিল। তবে এবার ৪ মাত্রার ঝড়ে গতিবেগ গিয়ে দাঁড়ায় ঘণ্টায় ২৫০ কিমি। ১৪০০ কিলোগ্রাম বালির বস্তা ফেলে বাঁধ রক্ষার প্রচেষ্টা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়। আবহ ও পরিবেশবিদ্‌দের ধারণা যে আগামী দিনগুলোতে এর থেকেও বড় মাত্রার হারিকেন নিয়ে আসতে পারে এর চেয়েও বেশি তাণ্ডবলীলা।

চাদ, আফ্রিকা মহাদেশের একটি বৃহৎ হ্রদ প্রায় অবলুপ্তির পথে

বিশাল আফ্রিকা মহাদেশের মধ্য-পশ্চিমদিকের একটি দেশ চাদ। এর পশ্চিমদিকে রয়েছে চাদ হ্রদ। সীমানা অঞ্চলে রয়েছে নাইজার এবং নাইজারিয়া নামে দুটি দেশ। একদিকে শুষ্ক মরুভূমি সাহারা এবং অন্যদিকে এর কিছু পরেই শুরু হয়ে যাচ্ছে মধ্য আফ্রিকার সুবিশাল ক্রান্তীয় বর্ষণসিক্ত বনভূমি। আগে বর্ষার মরশুমে এর আয়তন গিয়ে দাঁড়াত ৫২,০০০ বর্গ কিমি। কিন্তু শুখা মরশুমে এর আয়তন কমে অর্ধেক হয়ে দাঁড়াত। জলের গভীরতা কোথাও সাড়ে চার মিটারের (১৫ ফুট) বেশি হত না। জুলাই থেকে অক্টোবরের মরশুমের বৃষ্টিপাতই এই হ্রদের জলপ্রাপ্তি। হ্রদটির জলবিভাজিকা অঞ্চলের পরিমাণ প্রায় ২৫ লক্ষ বর্গ কিমি। জনসংখ্যার পরিমাণ প্রতি বর্গ কিমি কেবল ১২ জন। তবে প্রতিনিয়ত জনসংখ্যার চাপ এবং দ্রুত নগরায়ন হ্রদটি ক্রমশ সংকুচিত হয়ে যাচ্ছে। ১৯৬২ সালে আয়তনের দিক দিয়ে আফ্রিকা মহাদেশের আয়তন ছিল চতুর্থ। এখন এর আয়তন ভয়ঙ্করভাবে কমে গিয়ে কেবলমাত্র পাঁচ শতাংশে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। এর অন্যতম কারণ ১৯৬২ সাল থেকে ভয়াবহ অনাবৃষ্টি। এছাড়া সংলগ্ন তৃণভূমি অঞ্চলে অতিমাত্রায় পশুচারণ প্রবণতাও খরার আরও একটি কারণ বলে ধারণা করা হয়। জলস্তর নেমে যাওয়ায় সেচ ব্যবস্থার সমস্ত পরিকল্পনা ব্যর্থতার পর্যবসিত হচ্ছে। অপেক্ষাকৃত নীচু জমিতে যেখানে হ্রদের প্রভাবে মাটি ভেজা থাকছে, সেখানে ধান, গম, ভুট্টার কিছু চাষ সম্ভব হচ্ছে। তবে এই বিস্তীর্ণ জলবিভাজিকা অঞ্চলের ২ কোটি বসবাসকারী মানুষের খাদ্যের ভাণ্ডারে আজ দেখা দিয়েছে বিরাট সংকট।

দক্ষিণ আমেরিকার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে নদীপথ ব্যবহার করে নৌ-পরিবহনের ব্যবস্থা

পারানা দক্ষিণ আমেরিকার অন্যতম প্রধান নদী। মূলত উরুগুয়ে, প্যারাগুয়ে, আর্জেন্টিনা ও ব্রাজিলের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে থাকে। ব্রাজিল ও আর্জেন্টিনার সীমানার মধ্যে রয়েছে এই নদীর উপরে পৃথিবীর অন্যতম সর্বোচ্চ ইগুয়াজু জলপ্রপাত। এর পরে ব-দ্বীপ অভিমুখে প্রায় ১২০০টি বিভিন্ন ধারার মাধ্যমে নদীটি বুয়েনোস এয়ারেশ শহরের পাশ দিয়ে লা প্লাটার মধ্যে এর বিপুল জলরাশি ঢেলে দেয়। এখন মূল নদীটি এবং এর শাখা নদীসমূহের প্রবাহকে ব্যবহার করে বৃহৎ নৌ-পরিবহনের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। সামুদ্রিক বন্দরের অপ্রতুলতার জন্য প্রায় সব দেশগুলোই এই প্রকল্পকে স্বাগত জানাচ্ছে। হিড্রোভিয়া নামে এই প্রকল্পটি তাই একটি বহুজাতিক প্রকল্প। প্রধানত পারানা ও তার প্রধান উপনদী প্যারাগুয়ের প্রবাহকে ব্যবহার করে এই প্রকল্পের মাধ্যমে উপকৃত হবে ব্রাজিল, বলিভিয়া, প্যারাগুয়ে, উরুগুয়ে ও আর্জেন্টিনা, খনিজ পদার্থ, খাদ্যশস্য এবং অন্যান্য পণ্য পরিবহনে একটা বিরাট সুবিধেজনক পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে। তবে এর বিপরীত দিকটাও রয়েছে। এই অঞ্চলে রয়েছে পালটালাল নামে একটি বিরাট জলাভূমি। নদীগুলোর বন্যার জলে পুষ্ট এই জলাভূমি তাই একটি বিশাল সংকটের সম্মুখীন। বিভিন্ন প্রজাতির স্থল ও জলজ প্রাণী ও উদ্ভিদের প্রাণান্তকর ব্যবস্থা হতে পারে। প্রাকৃতিক জলাবর্তের একটি বিরাট সমস্যা দেখা দিয়ে পরিবেশের ভারসাম্য বিঘ্নিত হতে পারে।

সংকলক : অবসরপ্রাপ্ত মুখ্য বাস্তুকার

লেখা পাঠাবার জন্য আবেদন

সেচপত্র পত্রিকাটি সেচ ও জলপথ দপ্তরের সেচব্যবস্থা, নিকাশিব্যবস্থা ও বন্যানিয়ন্ত্রণ-বিষয়ক বিবিধ উন্নয়নমূলক কাজের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত একটি মুখপত্র। প্রকাশের দিন থেকেই এই পত্রিকা পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। এমন একটি পত্রিকার জন্য উক্ত বিষয়গুলির উপর সেচ বিভাগ ও দপ্তরের সবার কাছে লেখা আহ্বান করছি ; সঙ্গে উপযুক্ত ছবি। সংক্ষিপ্ত সংবাদের স্বার্থে শীঘ্র ক্যাপশন-সহ ছবি পাঠান।

প্রধান সম্পাদক
সেচপত্র

Irrigation & Waterways Dept. Govt.of West Bengal

Flood Management

Flood Scenario of West Bengal

West Bengal has 37,660 sq. km flood prone area spread over 1 the total geographical area of the state is 88,752 sq. km. An statistics of flood that occurred during last 41 years (from .196 that only on 5 occasions the state has not faced any severe devastated area crossed 20,000 sq. km in 4 different years medium magnitude i.e. between 2,000 to 10,000 sq. km. occasions.

This analysis of area flooded against years of occurrence (ca produced below :

Flood affected area (in sq. km)	Years during which the flood occurred
Below 500	1985, 89, 92, 94 & 97
Between 500 - 2000	1962, 63, 64, 65, 66, 72, 75 & 96
2000 - 5000	1960, 61, 67, 69, 70, 74, 76, 80, 81 & 82
5000 - 10000	1973, 77, 93, 95 & 98
10000 - 15000	1968, 79, 83, 90 & 99
15000 – 20000	1971, 86, 87 & 88
Above 20000	1978, 84, 91 & 2000

The Flood Problem :

The flood problems of the state are of different nature at differ rivers Teesta, Torsa, Jaldhaka, Raidak-I, Raidak-II etc. flow districts of Jalpaiguri and Cooch Behar originate in the neighbo Bhutan and the state of Sikkim and flows down to Bang neighbouring country to meet the Bramhaputra at different locat

+++ --